রবিবারের বৈঠক

যুগশঙ্খ SUPPLI

রবিবার, ৬ মে ২০১৮

সুচিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

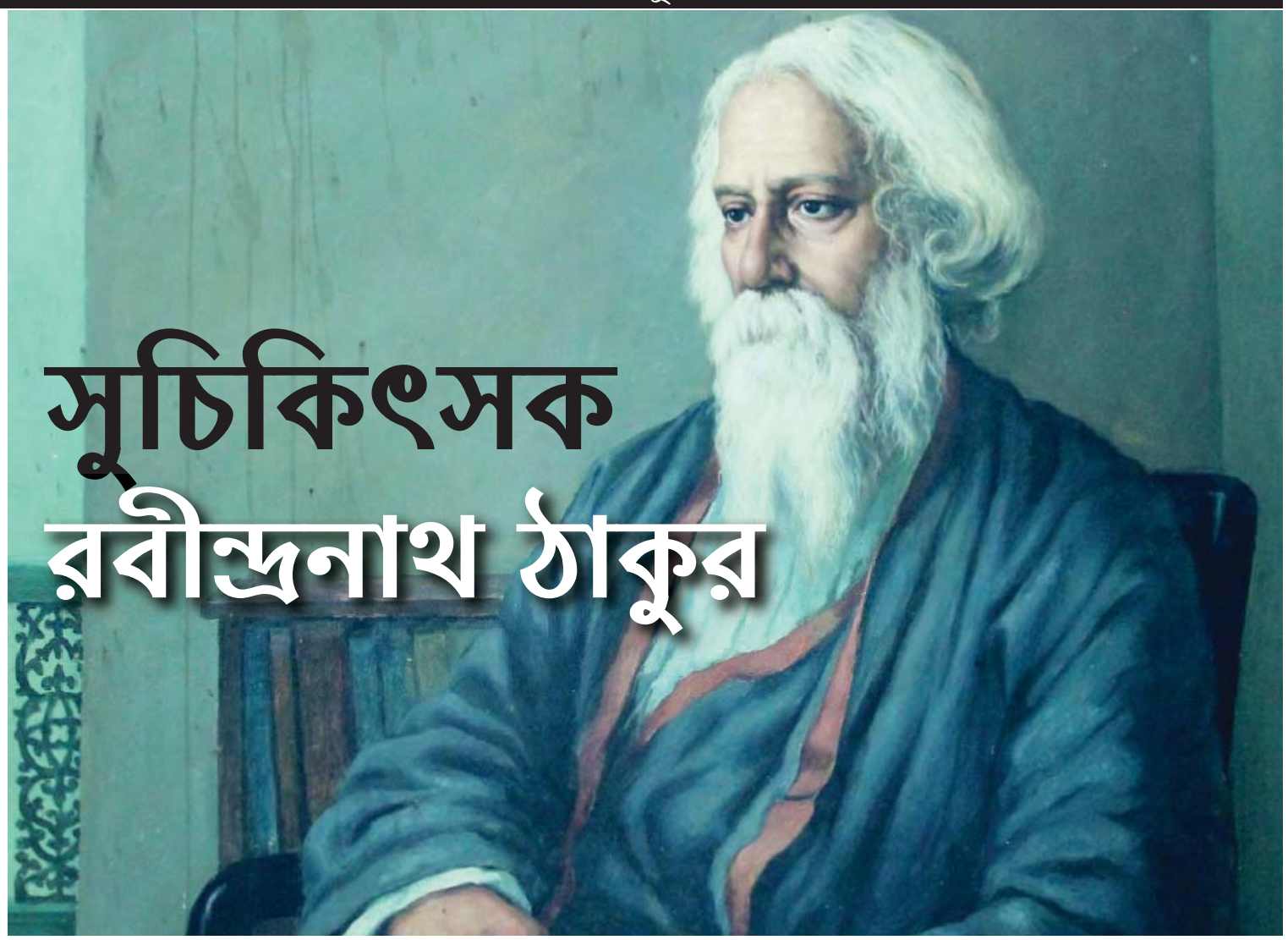

উমা পুরকায়স্থ

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভার কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু একাধারে তিনি যে একজন সুচিকিৎসক ছিলেন, তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। কারও কোনও অসুস্থতা শুনলে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়তেন এবং কী করে তাঁকে একটু আরাম দেওয়া যায় সে চিন্তা করতেন। এই সহানুভূতিশীল চিন্তাধারা নিয়েই তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বইপত্র পড়া শুরু করেন। তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ছিলেন এবং তিনি জানতেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা মনোস্তত্ত্বের উপরই অনেকটা নির্ভর করে। তাঁর কাব্যচর্চার বাইরে যখনই তিনি সময় পেতেন, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসার বইপত্র পড়তেন, যাতে হঠাৎ কোনও বিপজ্জনক অবস্থায় কাউকে সাহায্য করতে পারেন।

বিশিষ্ট রবীন্দ্রসেবিকা রানী চন্দ লিখেছেন, ‘গুড়ি গুড়ি সাদা পিলভরা বায়োকেমিকের একগাদা শিশি থাকত গুরুদেবের সাথে সাথে। যেখানে যখন বসতেন বা লিখতেন শিশি সমেত ট্রে পাশে থাকা চাই। আর থাকত চিকিৎসার মোটা বইখানা। যখনই সময় পেতেন মন ঢেলে বইখানি পড়তেন...। কেউ যদি তাঁর কোনও অসুখ বলে ওষুধ চাইতে আসতেন, তাহলে গুরুদেব অত্যন্ত খুশি হতেন। অতি আগ্রহে ওষুধ ঢেলে দিতেন, বারে বারে তাঁর বাড়িতে লোক পাঠিয়ে খবর নিতেন রোগী কেমন আছে। ফিরে ফিরে ওষুধ বদলে বদলে পাঠাতেন। গুরুদেব তাঁর গানের ও কবিতার প্রশংসার চেয়ে হাজারগুণ বেশি খুশি হতেন যদি কেউ এসে বলত যে তাঁর ওষুধে অমুক অসুখটা সেরে গেছে। গুরুদেবের সেই খুশিভরা মুখ দেখবার মতো ছিল।’

পরবর্তীকালে ররীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেখানেই যেতেন, সঙ্গে থাকত তাঁর হোমিওপ্যাথির বইটা এবং ওষুধের বাক্স। কথাটির পরিপ্রেক্ষিতে একটি ঘটনার কথা বলা যায়। ১৯২৩ সালের মে-জুন মাস; বাংলাদেশের প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে শিলং ছুটে আসেন একটু ঠান্ডা হতে। ‘ঠান্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলং নামক পর্বতে’... (শিলঙের চিঠি)। তখন তাঁরা উঠেছিলেন রিলবং-এর ‘জিৎভূমি’ বাড়িতে, বাড়িটার মালিক ছিলেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী মনীষাদেবী। কবি এ বাড়িতে প্রায় দু’মাস কাটিয়ে গেছেন এবং রচনা করেছেন ‘রক্তকরবী’, ‘শিলংয়ের চিঠি’ সহ আরও অনেক কাব্য, নাটক ও কবিতা। তখন তিনি তাঁর হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স এবং বই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

জানা যায় যে একই সময়ে, অর্থাৎ ১৯২৩ সালের মে মাসে সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (ঠাকুরবাড়ির জামাই) শিলংয়ে এসেছিলেন কুকুরের কামড়ের ইনজেকশন নেওয়ার জন্য; তাঁকে ওড়িশার সম্বলপুরে কুকুর কামড়েছিল। তখন Anti rabies ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা শিলং-এর Pasteure Institute ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর কোথাও ছিল না। তাই লক্ষ্মীনাথ তাঁর কন্যা রত্নাকে নিয়ে শিলং আসেন। কিন্তু শিলং-গুয়াহাটির রাস্তায় প্রচণ্ড বৃষ্টি নামে, এবং ঠান্ডায় রত্নার ভীষণ জ্বর আসে। শিলং পৌঁছেই লক্ষ্মীনাথ রত্নাকে নিয়ে তাঁর বিশেষ বন্ধু মি. আই. মজিদের বাড়িতে ওঠেন। বাড়িটার নাম ‘গুলিস্থান’, বর্তমানে সে বাড়ির নাম ‘শিবধাম’।

সারারাত রত্না জ্বরে ছটফট করেছে, তাই চিন্তিত লক্ষ্মীনাথ সকালবেলায় ছুটলেন ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে। বিধানচন্দ্র রায় গরম কাটাতে তখন শিলং-এ তাঁর কেঞ্চেশ ট্রেসের বাড়িতে (বর্তমানে Circuit House) এসেছিলেন। সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের দেখা। রবীন্দ্রনাথ রত্নার অসুস্থতার খবর শুনে চিন্তিত হলেন এবং নিজের থেকেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি কি একটু হোমিওপ্যাথি ঔষুধ দিয়ে দেখতে পারেন? বিধানচন্দ্র রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললেন যে, ‘ক্ষতি কী? হয়তো এতেই সেরে যাবে।’

রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীনাথকে নিয়ে ছুটলেন ‘জিৎভুমি’ বাড়ির দিকে, ওখান থেকে তাঁর হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স নিয়ে এলেন গুলিস্থান বাড়িতে এবং রত্নাকে ঔষধ দিলেন। সাময়িক উপশম হলেও জ্বর ছাড়ল না। রত্নার টাইফয়েড হয়েছিল; পরে ডাঃ বিধান রায়ের চিকিৎসাতেই সুস্থ হয়েছিল। এখানে উপশম বড় কথা নয়, রোগীর প্রতি তাঁর যে উদ্বিগ্ন অনুভুতি, সেটাই লক্ষ্যণীয়। তখন শিলং-এ লোকাল ট্যাক্সি ইত্যাদি চলত না, পায়ে হেঁটেই পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি এতটা পথ ছোটাছুটি করেছিলেন বাষট্টি বছর বয়সি বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘গুলিস্থান’ বাড়িতেই চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন ১৯২৩ সালে এবং মি. মজিদের বৃদ্ধা মায়ের অনুরোধে একদিন গান গেয়েও শুনিয়েছিলেন বলে জানা যায়। আমি ‘গুলিস্থান’-এর ঠিক পাশের বাড়িতেই থাকি এবং ভাবি এই পথেই একদিন এত বড় মনীষীর চরণ ধূলি পড়েছিল!

মৈত্রেয়ী দেবীর লেখায় রবীন্দ্রনাথের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯৩৩ সালের কথা। গরমের ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং এসেছিলেন কিছুদিনের জন্য এবং উঠেছিলেন ‘গ্লেন ইডেন’ বাড়িতে। সেখানে দার্জিলিং প্রবাসী কিছু সংখ্যক বাঙালি শ্রোতার উৎসাহে সাহিত্য বাসর হয়েছিল, যেখানে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন ‘মালঞ্চ’ ও ‘বাঁশরী’ দু’টি গল্প। সেই আসরে মৈত্রেয়ী দেবীও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি তখন প্রচণ্ড কাশিতে ভুগছিলেন। সাহিত্যপাঠ চলছে, কিন্তু মৈত্রেয়ীর অদম্য কাশি কিছুতেই শাসন মানছে না। তিনি বাধ্য হয়ে আসর ছেড়ে একটু দূরে দরজার বাইরে চলে এলেন এবং হঠাৎ দেখেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মৈত্রেয়ীর অনর্গল যন্ত্রণাদায়ক কাশিতে তিনি ব্যথিত হচ্ছিলেন এবং পাঠে মন বসাতে পারছিলেন না। তাই আসর ছেড়ে উঠে এসেছিলেন এবং মৈত্রেয়ীকে ঔষধ দিয়ে সহানুভূতি নিয়ে বলেছিলেন, ‘এক্ষুনি কমে যাবে, কাশি এলেই মুখে দিও।’ তারপর একটা গরম চাদর দিয়ে বললেন, ‘এটা মাথায় গলায় জড়িয়ে বস।’ মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন, ‘এই সহানুভূতি ও করুণায় আমার ভিতরটা যেন গলে গিয়ে চোখে জল এল’ (‘স্বর্গের কাছাকাছি’, পৃ:১৭৯)। এই প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবী বলেছেন যে কবির চিকিৎসা বড় কথা নয়, রোগীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং মমত্ববোধ রোগীর মনকে স্পর্শ করত এবং অর্ধেক যন্ত্রণা কমিয়ে দিত।

১৯৩৫-এর মে মাসে তিনি গঙ্গায় হাউসবোটে থেকেও নির্মলকুমারী মহলানবীশকে প্রেসক্রিপশন দিয়েছিলেন, ‘তোমার Gland ফেটে গেছে শুনে ভালো লাগলো না। যাই হোক Calc Sulf টা ছেড়ো না। বরঞ্চ Silicia পরীক্ষা করে দেখা ভালো, যদি Sil ১২ না পাও, ৬ দিয়ে চেষ্টা করো। Calc Sulf- এর Potency বদল করে দেখো অর্থাৎ ১২।’

কবির গুণমুগ্ধ হেমন্তবালাকে ১৯৩২ সালে কবি একজিমার ওষুধ দিয়েছিলেন। কবির মৃত্যুর বছর খানেক আগে তাঁর সুচিকিৎসায় সজনীকান্ত সুস্থ হয়ে উঠলেন, সেই খবরে ১৯৪০-এর ২০ জুন কালিম্পং থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন-

‘আমার ওষুধে ফল পেয়েছ। বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন। যে বয়সে স্বভাবতই অন্য খ্যাতির পথে বালিচাপা পড়ে, সেই বয়সে তিনি একটা নতুন পথ খুলে দিলেন। আমার জীবন-চরিত্রের শেষ অধ্যায়ে এই খবরটা দিয়ে যেতে পারবো। এ বিদ্যেটা সরস্বতীর এলাকায় নয়, ওটা ধন্বন্তরী মহলে যেখানে রস নেই, রসায়ন আছে। যাঁরা সাইকোলজির নাড়ি টেপেন, এখানকার নাড়ির খবর তাদের হাতে নেই।

এরপর পরের পাতায়

রবিবারের চিঠি

যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ৬ মে ২০১৮

...যাক, তোমার মাথাটাকে চাঙ্গা করার জন্য আমার বায়োকেমিক বিধান হচ্ছে কেলিফস 6x। কিন্তু পূর্বের ওষুধের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে, দিনে পাঁচটা বড়ি, অন্ততঃ তিনবার সেবনীয়।' ('কবির সংসার', পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়)।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রাবাসের অনেক ছাত্রকেও তিনি তাঁর বায়োকেমিক এবং হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়ে অনেক সংকটজনক অবস্থায় সুস্থ করেছেন। ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য এ-প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রত্যহই দেখতাম আশ্রমের বাসিন্দাদের ভিতর থেকে রোগীরা আসতো তাঁর কাছে ওষুধ নিতে। টেবিলের ওপর থাকতো মোটা মোটা হোমিওপ্যাথির বই, আর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স। রোগীর মুখে বিবরণ শুনে, কখনও বা বই দেখে আর কখনও বা না দেখেই তিনি ওষুধ নির্বাচন করতেন এবং তিনি যা ওষুধ দিতেন তাতে তারা সুস্থও হয়ে যেত। দেখতাম তো তারা খুব বিশ্বাস করে ওষুধ নিয়ে যায়। আমি মনে মনে হাসতাম, মুখে কিছু না বললেও। একদিন ভোর রাত্রি থেকে আমার স্ত্রীর পেটে কলিকের ব্যথা ধরল। আমি মুশকিলে পড়লাম। সে সময় কোথায় ওষুধ পাই? একটু বেলা হতেই কবির কাছে গেলাম, তিনি শুনেই বললেন—'চলো একবার দেখে আসি। কিন্তু আমার ওষুধে কি তোমার বিশ্বাস হবে? আমি বললাম—' তাছাড়া এখন তো আর কোনও উপায় নেই। কবি নিজেই এলেন আমার স্ত্রীর কাছে। তাঁকে কেবল কয়েকটা প্রশ্ন করলেন—পেটে চাপ দিলে একটু আরাম হয় কিনা, পা গুটিয়ে শুতে ইচ্ছে হয় কিনা ইত্যাদি। তারপর ফিরে গিয়ে একটি মাত্রা ওষুধ নিয়ে বললেন—এখনই এটা খাইয়ে দাও গে। এতেই সেরে যাবে আশা করি। দিলাম ওষুধটা খাইয়ে। আশ্চর্য! ঘণ্টাখানেক পরে ব্যথা থেমেও গেল।

আরও একদিনের কথা। সেদিন দেখলাম রোগীদের মধ্যে একটি কিশোর বালককে আনা হয়েছে, পরে জেনেছিলাম সে ওখানকার গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছেলে। তার মুখের একপাশে ফুলে উঠেছে, সিঁদুরবর্ণ একটা দগদগে প্রদাহ গলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, সঙ্গে ভীষণ জ্বর। বুঝতে পারলাম 'ইরিসিপেলাস' হয়েছে, বাঁচানো মুশকিল। কবিকে বললাম, একে এখনই হাইডোজের সিরাম ইনজেকশান দেওয়া দরকার।

কবি একটু হেসে বললেন, এখন তো আমার ওষুধই চলুক, দুদিন দেখাই যাক না কি হয়, তারপর না হয় তোমার ব্যবস্থা করা যাবে।

আমি বললাম, এ রোগে দু'দিন পর্যন্ত সবুর সইবে কি? কবি আমার কথার কোনও উত্তর দিলেন না। নীরবে কয়েক মাত্রা ওষুধ দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় ছেলেটি কয়েকদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

আমি তখন কবিকে বলতে বাধ্য হলাম, আপনার চিকিৎসা অতি আশ্চর্য দেখলাম। এতো বড় রোগটা আপনি ওই ছোট ছোট গুলি ওষুধ দিয়ে সারালেন, এ কথা বিশ্বাস না করে উপায় নেই, নিজের চোখেই দেখুলম।

কবি হেসে বললেন, তবুও তোমরা আমাকে ডাক্তার বলে মানবে না। আমি ফি নিই না, তাই ডাক্তার নই; যদি মোটা ফি নিতাম, তাহলে সবাই বলতো, একজন মস্ত বড় ডাক্তার। তাহলে একটা গল্প বলি শোন—

'কিছুদিন আগে রামগড় পাহাড়ে গিয়েছিলাম। সেখানকার ডাকঘরে আমার নামে যে সব চিঠিপত্র আসতো, তাতে প্রায়ই শিরোনামে থাকতো ইংরেজিতে 'ডক্টর রবীন্দ্রনাথ টেগোর' (কিছুদিন আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবি-কে সাম্মানিক 'ডক্টর' উপাধি দিয়েছিল এবং অনেকেই তাঁর নামের আগে ওটা ব্যবহার করতেন), তাই দেখে সেখানকার পোষ্টমাস্টার ভাবলেন, এ বুঝি একজন মস্ত বড় চিকিৎসক, কলিকাতা থেকে এসেছেন। চেনাশোনা লোকেদের কাছে কথাটা বেশ রটালো। তরপর একদিন এক কঠিন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে আমার কাছে এনে হাজির করল। বলল, 'লোকটা বড় গরীব, একটা কিছু উপায় করে দিন'। আমি কী আর করি, চিন্তা করে দিলাম তাকে ওষুধ। ধীরে ধীরে সে অনেকটা সেরে উঠল...আশেপাশের চারদিক থেকে আমার কাছে নানা রকম রোগী প্রতিদিন আসতে লাগলো; যত বলি যে আমি সত্যিকার ডাক্তার নই, কে শোনে সে কথা! যতদিন ওখানে ছিলাম, ততদিন আমাকে রীতিমতো ডাক্তারি করতে হয়েছিল...তবে বিশ্বাসেও অনেক ফল হয়।'

আমার বিশ্বাস যতটা হোক আর না হোক, আমার স্ত্রীর কিন্তু অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর ডাক্তারিতে। মাঝে মাঝে তাঁর শিরঃপীড়া হতো, শয্যাগত থাকতেন কয়েকদিন, মাথায় বরফ দিতে হতো; কিন্তু কবির ওষুধ ক্যালিফস খেয়ে তিনি সুস্থ হতেন' (ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য-'নানা জনের রবীন্দ্রনাথ')।'

সুচিকিৎসক রবীন্দ্রনাথকে জানতে গিয়ে আমরা একজন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল দরদি মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাই। যিনি রোগীর রোগ-যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন এবং রোগের উপশম না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পেতেন না। রোগীদের মন জয় করতে পেরেছিলেন বলেই কবি সুচিকিৎসক রূপে এত খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিলেন। জানা যায় যে স্ত্রী মৃণালিনী ও দুই কন্যার অকালমৃত্যু এবং মর্মান্তিক মৃত্যু যন্ত্রণা কবিকে পরবর্তীকালে হোমিও চিকিৎসায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, যাতে সামান্যতম আরামও মৃত্যুপথযাত্রীকে দিতে পারেন।

আ লো চ না

বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সমরজিৎ চক্রবর্তী

সংবাদপত্রেই ধরা থাকে সময়ের ইতিবৃত্ত। কোনও সময়কালের রাজনৈতিক, সামাজিক এমনকী অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে সংবাদপত্রের কোনও বিকল্প নেই। আর পত্রিকার মধ্যে দৈনিক পত্রিকার গুরুত্ব তো আরও বেশি। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের নাম 'সংবাদ প্রভাকর'। প্রকাশিত হয় ১৮৩৯ সালে, বাংলার ১ আষাঢ় ১২৪৬ সনে।

দৈনিকরূপে প্রকাশিত হওয়ার আগে 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হতো প্রতি শুক্রবার। ১৮৩১ সালে ৩ ফেব্রুয়ারির 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে জানা যায়, সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সালে ২৮ জানুয়ারি (১৬ মাঘ ১২৩৭ সনে)। সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ১৮৩২ সালে 'সমাচার দর্পণ'-এর ২ জুন সংখ্যা থেকে জানা যায় এক বছর চার মাস পর, ১৮৩২ সালের ২৫ মে ৬৯তম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায় 'সংবাদ প্রভাকর'। পুনরায় চালু হয় চার বছর পর। ১৮৩৬ সালের ১০ আগস্ট বুধবার।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন কবি। লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না। তবু তাঁর ইচ্ছা হল একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করবেন। এই মর্মে তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে ইংরেজিতে লেখা আবেদনপত্রে বাংলায় স্বাক্ষর করে আবেদন করলেন। সরকার তাঁকে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য অনুমতি প্রদান করে ১৮৩১ সালে ১১ জানুয়ারি।

'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের অবদান ছিল অপরিসীম। গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়সি এবং তাঁর কবিতার গুণগ্রাহী। যোগেন্দ্রমোহনের ব্যয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে প্রকাশিত হতো চোরাবাগানের (৩২ নং সিমলা) একটি ছাপাখানা থেকে। মাস ছ'য়েক পরে, ১২৩৮ সনের শ্রাবণ মাসে ঠাকুরবাড়িতেই প্রভাকর প্রকাশের জন্য একটি ছাপাখানা স্থাপন করা হয়। সংস্কৃত কলেজের অলংকার শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভাকরের লিপির বিষয়ে সাহায্য করতেন। তাঁর রচিত দুটি শ্লোক পত্রিকার শিরোনামের নীচে জ্বলজ্বল করত।

১২৩৯ সনে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর পূর্ব উল্লেখিত ৬৯তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে প্রভাকর বন্ধ হয়ে যায়। যদিও ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর তিন মাস আগেই পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিলেন।

দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার পর সংবাদ প্রভাকর একটি উচ্চমানের সংবাদপত্র হয়ে ওঠে। আর এর সমর্থন মেলে ১৮৪০ সালে ফেব্রুয়ারির ১৩-তে প্রকাশিত 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'-র সংখ্যায়। জানা যায়, ১৮৪০-এ 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভার' দেশীয় সংবাদ-সাময়িক পত্রগুলোর মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর'-কে উচ্চস্থানে বসিয়েছে।

'সংবাদ প্রভাকর'-এর হাত ধরেই বাংলা রচনায় আসে নতুন আঙ্গিক। বাংলা সাহিত্য আধুনিক তথা সাবালক হয়ে উঠতে শুরু করে তখন থেকে। বাংলাভাষা হয়ে ওঠে আরও তেজস্বিনী। প্রভাকরের বলিষ্ঠ রচনায় আকৃষ্ট হয়ে আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক তো ১২৩৯ সনে ১০ শ্রাবণ 'সংবাদ রত্নাবলী' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করে ফেলেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মনমোহন বসু ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিকরা সাহিত্যজগতে পা রাখেন প্রভাকরের হাত ধরেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় প্রভাকরের ১৮৫২ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন তাঁর সাহিত্যগুরু। রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালংকার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, সীতানাথ ঘোষ, রামকমল সেন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রমুখের লেখায় সমৃদ্ধ সংবাদ প্রভাকরের পাতা ঝলমল করে উঠত রূপে আর জৌলুসে।

এই আমলে আর যে সকল সংবাদপত্র প্রকাশিত হত, সেগুলো মূলত কলকাতা ও তার আশপাশ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে এই পত্রিকার বিস্তৃতি বাড়ায় সুদূর গ্রাম-বাংলার মানুষরাও সংবাদ পাঠে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। যার ফলে অচিরেই 'সংবাদ প্রভাকর' হয়ে ওঠে সাধারণ লোকসমাজ ও উচ্চশিক্ষিত সমাজের যোগসূত্র। এই কারণে ১৮৩৮ সালে ৮ নভেম্বর সংখ্যায় 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তথা 'সংবাদ প্রভাকর'-কে উদারপন্থী হিসাবে আখ্যায়িত করে। উদার যোগসূত্রের ব্যাপ্তি যে কী বিশাল, তা লক্ষ করেই 'বঙ্গদর্শন'-এর পরিকল্পনা করেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১২৬০ সনে (১৮৫৩ সাল) সংবাদ প্রভাকরের গ্রাহক পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে যায়। ওই বছরেরই ১ বৈশাখ থেকে দৈনিক সংবাদপত্রের পাশাপাশি 'সংবাদ প্রভাকর' একটি মাসিক সংস্করণ চালু করে। এই সনেই অর্থাৎ ১২৬০ সনের ১ পৌষের মাসিক সংখ্যায় অনেক পরিশ্রম করে সংগৃহীত সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তাঁর কালীকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদি প্রকাশ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ১২৬২ সনে (১৮৫৫) ১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশ করেন কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী ও তাঁর পদাবলী। এইরকমভাবে ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে অষ্টাদশ- ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, রামমোহন বসু, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, কেষ্টা মুচি, লালু নন্দলাল, রাসু, নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস প্রমুখের তথ্য সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যকে চিরজীবী করে তোলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই মহান কাজে ব্রতী না হলে এই সকল মনীষীর কোনও অস্তিত্বই হয়তো আমাদের কাছে থাকত না। ভ্রমণ নিয়েও যে সাহিত্য হয়, তা সংবাদ প্রভাকরই প্রথম উপলব্ধি করে। গদ্যে ভ্রমণকাহিনি রচনা করার ফলে উন্মোচিত হয় বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন দিক।

সংবাদপ্রভাকর
প্রাত্যহিকপত্র

অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের। ১২৬৫ সনের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর সম্পাদনার পর শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ১৮৫৯ সালের ২৩ জানুয়ারি কবি ও সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অমৃতলোকে যাত্রা করেন। তাঁর ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত হাল ধরেন প্রভাকরের। কিন্তু অসুস্থতার জন্য রামচন্দ্র সম্পাদনার মতো গুরু দায়িত্ব বেশিদিন সামাল দিতে পারেননি। এরপর হাল ধরেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার, যন্ত্রশিল্পের উন্নতি, নতুন মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যা- এসবই ছিল প্রভাকরের এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। ধর্মসভা সম্বন্ধে বিদ্রুপ, তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্ম নেতাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধতাই ছিল দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর'-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

প্রথমদিকে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করলেও পরবর্তীকালে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর মত কিছুটা বদল হয়। স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিধবাবিবাহকে অকাট্য বলে রায় দেয়। কৌলিণ্যপ্রথার বিরুদ্ধে বলতে গেলে এক প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে।

নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও, জমিদার শ্রেণির অর্থানুকূল্যে পুষ্ট বলে কৃষকের জন্য তেমন সমবেদনা ছিল না। কৃষকের প্রতি জমিদার শ্রেণির শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলা তথা ভারতের মধ্যে দেশীয় ভাষায় প্রথম দৈনিকটি ছিল প্রায় নীরব।

রবিবারের বৈঠক
যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ৬ মে ২০১৮

রবীন্দ্রনাথের কোনও স্থায়ী বাড়ি ছিল না

দিলীপ মজুমদার

মানুষ তাঁর পরিবারকে নিয়ে একটি স্থায়ী ঘর বাঁধতে চায়। যে-ঘরে থাকবে তাঁর নিজের মানুষ, নিজস্ব আসবাবপত্র এবং পছন্দের জাগতিক সামগ্রী। কর্তব্যের খাতিরে অন্যত্র সে যায়, কিন্তু ব্যাকুল হয় ঘরে ফিরে আসার জন্য। রোম্যান্টিক কল্পনাবশত ভবঘুরে জীবন তাঁকে আনন্দ দেয়, কিন্তু খুব কম মানুষ যাপন করে ভবঘুরে জীবন। তাঁর অস্তিত্বের সুরক্ষা আছে সীমানাচিহ্নিত নেমপ্লেটওয়ালা স্থায়ী ঘরে। এরকম নেমপ্লেটওয়ালা স্থায়ী ঘর কি রবীন্দ্রনাথের ছিল? যে-বাড়িতে আছেন তাঁর প্রিয়জনেরা, আছে বাক্সপ্যাঁটরা, নিত্য ব্যবহার্য আসবাবপত্র? একটু অনুসন্ধান করে দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় ১৮৮৩ সালে। তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর একটি নিজস্ব ঘরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন দেবেন্দ্রনাথ। ১৮৮৪ সালে ১৮৫০ টাকা ব্যয়ে এই ঘর তৈরি করেন ধর মল্লিক অ্যান্ড কোং-কে দিয়ে। স্থায়ী ঘর হল বটে কিন্তু সে ঘর বেঁধে রাখতে পারল না রবিকে। ১৮৯০ সালে তাঁকে দেখা যায় শান্তিনেকেতনে, শান্তিনিকেতন গৃহের দোতলায়। কিছুদিন পরে দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ খড়ের চালার একটি বাড়ি তৈরি করেন। তার নাম 'নতুন বাড়ি'। ১৯০৬ সালের প্রথমদিকে তাঁকে দেখা যায় 'দেহলি'তে। সত্যপ্রসাদ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এ-বাড়ি তৈরি করেছিলেন তিনি। এই বছরেরই শেষ দিকে তিনি বাস করেছেন শান্তিনিকেতন গৃহের দোতলায়। ১৯১৪ সালে রামগড় থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ উঠলেন সুরুলের বাড়িতে পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে। ১৯১৫ সালে কবিকে দেখা যায় 'দেহলি'র ছোট ঘরে। সে বাড়ির সামনেই পিয়ারসনের নতুন বাড়ি তৈরি হয়। তার নাম 'দ্বারিক'। সে-বাড়িতে অবশ্য পরে কিছুকাল বাস করেছিলেন তিনি।

১৯১৯ সাল। কবি সিলেট-চাঁদপুর-গোয়ালন্দ থেকে কলকাতায় ফিরলেন। একদিন জোড়াসাঁকোয় থেকে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানে উত্তর সীমায় তৈরি হয়েছে নতুন দুটি কুটির। তার একটিতে আশ্রয় নিলেন তিনি। মাটির ঘর, খড়ের চাল, দরমার কপাট। পরবর্তীকালে এ- বাড়ির নাম হয়েছে 'কোনার্ক'। যার পাশটিতে তৈরি হয়েছে উত্তরায়ণের অট্টালিকা। ১৯২৩ সালের শেষদিকে পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করে কবি ফিরে আসেন শান্তিনিকেতনে। এসে যে-বাড়িতে ওঠেন তার নাম 'মৃণ্ময়ী'। খড়ের চালের এই মাটির বাড়ি ১৯২১-'২২ সালে তৈরি করেন পিয়ারসন। অবশ্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মতে 'মৃণ্ময়ী' নয়, রবীন্দ্রনাথ উঠেছিলেন 'প্রান্তিক' নামক বাড়িতে। ১৯২৪ সালে কবি দিনকয়েক শ্রীনিকেতনের বৃক্ষাবাসে ছিলেন। সেখানে ছিল একটি বিশাল বটগাছ। কাসাহারা নামে এক জাপানি শিল্পী সেই গাছের উপর তৈরি করেন ঘর। ১৯২৫ সালে আবার তাঁকে দেখা গেল নবরূপায়িত 'কোনার্ক' বাড়িতে।

১৯২৯ সাল। জাপান ভ্রমণ শেষ করে কবি এলেন শান্তিনিকেতনে। উঠলেন 'উদয়ন'-এর দোতলায়। সেই উদয়ন, কিন্তু তার বিন্যাসে পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৩৫ সালে ৭৪তম জন্মদিনে কবি প্রবেশ করেন তাঁর নতুন বাড়িতে। সে-বাড়ির নাম 'শ্যামলী'। এ-বাড়ির পরিকল্পনায় আগাগোড়া ছিল ম্যুরাল ভাবনা। সে ভাবনার রূপদান করার জন্য নন্দলাল বসুর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রামকিঙ্কর বেইজ। ফ্রেস্কো পদ্ধতির বদলে এল আলকাতরা দিয়ে কালো রং করা মাটির রিলিফ ভাস্কর্য। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে কবি 'শ্যামলী'তে ছিলেন, কিন্তু বর্ষাকালে বোঝা গেল মাটির ছাদ নিরাপদ নয়। কবি লিখলেন-'আজ কানে কানে বলছ আমায়/আর নয় এবার তোলো বাসা।' ১৯৩৬ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর তিনি ছিলেন সুরুলের বাড়ির তিনতলায়। তারপর শান্তিনিকেতনে এসে 'পুনশ্চ'তে থাকার চেষ্টা করে না পেরে আশ্রয় নিলেন 'উদয়ন'-এর তিনতলায়। আবার ডিসেম্বরে চলে আসেন 'উদীচী'তে।

দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের কোনও স্থায়ী ঘর ছিল না। তিনি কবিতায় বলেছেন, 'আমারও নেই ঘর/আছে ঘরের দিকে যাওয়া।' ঘরের দিকে গেছেন তিনি কিন্তু কোথাও একনাগাড়ে তিন-চার মাসের বেশি থাকতে পারেননি। 'ভানুসিংহের পদাবলি'র ৫ নম্বর পত্রে বলেছেন, 'পাখিরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যায়। আমি হচ্ছি সেই জাতের পাখি। মাঝে মাঝে দূর থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড় করে ওঠে।'

কবির প্রথম বাহিরে যাত্রা ১৮৭২ সালের মে মাসে। কলকাতায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাবে সপরিবারে গেলেন পেনেটির গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছাতুবাবুর বাগানবাড়িতে। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে পিতার সঙ্গে হিমালয়ে কাটিয়ে এলেন পাঁচ মাস। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তি, 'কলকাতায় ছিলেম খাঁচার পাখি। কেবল চলার স্বাধীনতা নয়, চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ; এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখি, আকাশ খোলা কিন্তু পায়ের শিকল।' ১৮৭৪-এ কবির কোনও ভ্রমণ নেই। ১৮৭৫-এর জুলাইতে ডিসেম্বরে পিতার সঙ্গে বোটে সোজা শিলাইদহ। ১৮৭৬-এর মে-তে বিরহামপুর। তিনি লিখেছেন, 'এখন আর পায়ের শিকল নেই, তবে কর্তব্যের বন্ধন একটা আছে।' ১৮৭৭-এ জ্যোতিদাদা ও নতুন বউঠানের সঙ্গে গিয়েছেন গঙ্গা তীরবর্তী বাগানে। এখানে পেলেন মুক্তি ও আনন্দের আস্বাদ। তারপর থেকে শুরু হয়েছে তাঁর অন্তবিহীন পথ পরিক্রমা। বাহির থেকে ঘরে আবার ঘর থেকে বাহিরে— পথদেবতার কাছে আত্মসমর্পণ। কখনও স্থলপথে, কখনও জলপথে। বিপুল ক্ষুধা তাঁর। ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, গৃহগত বিষম টান নেই। যেখানেই যান সেখানেই তো নবজন্ম ঘটে।

সাধারণ মানুষ কোথাও একটু স্থির হয়ে না বসলে অস্বস্তিবোধ করেন, বারংবার স্থান পরিবর্তনে মনোসংযোগ বিঘ্নিত হয়, সৃষ্টিশীল কাজে মন বসানো যায় না। রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। স্থানান্তরে গিয়েও তাঁর অস্বস্তি নেই। অজস্র চিঠি লিখছেন, ডায়েরি লিখছেন, ভাষণ প্রস্তুত করেছেন, আশ্রম সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়েছেন, লিখেছেন গান-কবিতা-নাটক-উপন্যাস।

১৮৮৩ সালের জুন মাস। রবীন্দ্রনাথ গেলেন কর্নাটক রাজ্যের প্রধান সমুদ্র বন্দর কারোয়ায়। তিনি লিখেছেন, 'একদিন শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় হাইদার আলির গিরিদুর্গ দেখে ফেরার পথে এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন ঘুমের চেয়েও কোন গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল। সেই রাত্রেই যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহা সুদূর প্রবাসের সেই সমুদ্রতীরের বিগত রজনীর সহিত বিজড়িত' ['জীবনস্মৃতি'/১৭/৪০৭]। জানা যায় ফেরার সময় জাহাজে তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' কয়েকটা গান লিখেছিলেন।

১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর। শিলাইদহ, সাহাজাদপুরে বোটে ঘুরছেন কবি। ঝরনাধারায় উৎসারিত হচ্ছে গানের ধারা— 'এবার চলিনু তবে, যামিনী না যেতে জাগালে না কেন, 'ভালোবেসে সখী নিভৃত যতনে', 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর', 'যদি বারণ কর তবে গাহিব না, কীসের তরে অশ্রু ঝরে...'

১৯০৩ সালের এপ্রিল। মাসকয়েক আগে মৃত্যু হয়েছে মৃণালিনীদেবীর। কন্যা রেণুকা, মীরা ও শমীকে নিয়ে কবি এসেছেন হাজারিবাগ। কবিতা লেখা চলছে। মোহিতচন্দ্র সেনকে চিঠিতে লিখছেন, 'পরশু আমার জ্বর ছেড়েছে... কাল থেকে আমি গুটি তিনেক কবিতা লিখে ফেলেছি।' এখানেই 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের সূত্রপাত। বৈশাখের 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্য তার প্রথম অংশ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

১৯২৩ সালের মে মাস। শিলং-এ এসেছেন কবি। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাস। কবি জাহাজে। জাহাজেই কবিতা লেখা হচ্ছে— লিপি, ক্ষণিকা, খেলা ইত্যাদি। পোর্ট সৈয়দ বন্দরের কাছাকাছি কোথাও থেকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে রথীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'বাবা জাহাজে চড়ে অবধি লেখার mood-এ রয়েছেন। একটা diary-র মতো শুরু করেছেন— জানি না কতদূর চলবে। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে কবিতাও লেখছেন।' অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে লিখছেন, 'এবারে বক্তৃতার দুশ্চিন্তা নেই বলে কবিতা লিখতে মন দিয়েছি। ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে এসে এত কবিতা আমার জীবনে কখনও লিখিনি। ভারত মহাসাগরে গদ্যের সঙ্গে মিশেল দিয়ে কবিতা লিখেছি— এ জাহাজে একেবারে নির্জলা পদ্য। সাত দিনে বারোটা কবিতা স্বদেশের আবহাওয়াতেও সহজ নয়' ['দেশ'/৬ আষাঢ়/১৩৮২]। প্রশান্তকুমার পাল তাঁর 'রবিজীবনী'তে জানিয়েছেন যে কবির আর্জেন্টিনা ভ্রমণের অন্যতম ফসল তাঁর চিত্রশিল্পের সূচনা। পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি থেকে যার জন্ম। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর ভাষায় এই আঁকিবুকি থেকে বেরিয়ে আসত সব রকমের মুখ, প্রাগৈতিহাসিক দানব, সরীসৃপ অথবা নানান আবোল-তাবোল।

কুনুরে পিঠাপুরমের মহারাজের আতিথ্যে অবস্থানকালে ১৯২৮ সালের মে মাসে 'শেষের কবিতা' রচনার শুরু এবং জুন মাসে বেঙ্গালুরুতে রচনার সমাপ্তি। কীভাবে মুখে বলা গল্প থেকে এই উপন্যাসের জন্ম সে কাহিনি নির্মলকুমারী মহলানবিশ বিবৃত করেছেন 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে' বইতে।

১৯৩৫ সালের মে মাসের শেষদিক। শান্তিনিকেতনের দারুণ গরমে অতিষ্ঠ হয়ে কবি আছেন গঙ্গাবক্ষে 'পদ্মা' নামক হাউসবোটে। কবি-ঘনিষ্ঠ প্রভাতকুমারের কথায়, 'এবার গঙ্গাবক্ষে কাব্যশ্রী দেখা দিল বীথিকার সমিল ছন্দে। লেখা হল: বিদ্রোহী, গীতছবি, অবর্জিত, ছুটির লেখা, নিমন্ত্রণ, ছায়াছবি, নাট্যশেষ।'

'অতিথি' গল্পের তারাপদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তাহার জন্ম-নক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথও কিন্তু গৃহহীন। তাঁর নিজস্ব, নির্দিষ্ট কোনও বাড়ি ছিল না। কিছুদিন এক জায়গায় বাস করার পর 'জগতের রথযাত্রা' তাঁকেও তারাপদের মতো চঞ্চল করে তুলত, মানসচক্ষে দেখতে পেতেন তিনি 'চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে...।' তখনই চঞ্চল হয়ে উঠত মন। কবির এই মনোভাব ধরা পড়েছে তাঁর নানা চিঠিতে। নিঝরিণীদেবীকে লিখেছেন— 'আমি দূর দেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে কোনও প্রয়োজন নেই, কেবল কিছু দিন থেকে আমার মন বলছে যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব' ['দেশ'/শারদ সংখ্যা/১৩৪৮]। বসুন্ধরা, ঐক্যতান প্রভৃতি কবিতায় সেই মনোভাব প্রকাশিত। হেমলতাদেবীকে লিখেছেন, 'আপনার সমস্ত কামনা যখন আপনাকে বন্দি করতে উদ্যত হয় তখন এক মুহূর্ত আর বিলম্ব না করে পালাতে ইচ্ছে করে... আমার টাকা নেই, কাজ রয়েছে, আমার অনেক অসুবিধা, তবু আমাকে আর বদ্ধ হয়ে বসে থাকতে দিচ্ছে না, আমাকে আজ এমন করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে কালের কোন প্রয়োজনে, সংসারের কোন দায়িত্ব আমাকে কোনওমতেই বসে থাকতে দিচ্ছে না। বেরো, বেরো, রাস্তায় বেরিয়ে পড়' [বিশ্বভারতী পত্রিকা/ষষ্ঠ বর্ষ/১ম সংখ্যা/১৩৫৪]। তারাপদের মতো পথদেবতার ডাক রবীন্দ্রনাথও শুনতে পেতেন। নিজের সেরকম মনের অবস্থা সম্পর্কে কবি লিখেছেন, 'সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কী হল! রাত দুটো-তিনটের সময় অন্ধকারে ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল' [রবীন্দ্র সঙ্গীত, পরিবর্ধিত সংস্করণ/শান্তিদেব ঘোষ/১৩৬৫/২০৮]। মীরাদেবীকে কবি লিখেছিলেন, 'আমি বারবার পরীক্ষা করে এবং চেষ্টা করে শেষকালে স্পষ্ট বুঝেছি যে বিধাতা আমাকে গৃহস্থ ঘরের জন্য তৈরি করেননি। বোধহয় সেইজন্যেই ছেলেবেলা থেকে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি... কোনও জায়গায় ঘরকন্না ফাঁদতে পারিনি।' [চিঠিপত্র/৪/২৫]।

রবিবারের চিঠি

যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ৬ মে ২০১৮

পূর্ব ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সকল পাঠকই পাঠাতে পারেন অপ্রকাশিত গল্প। গল্প পাঠাবেন সর্বাধিক ১২০০ শব্দের মধ্যে ইউনিকোডে টাইপ করে।

ফিরে দেখা

পঞ্জিকা

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের পরিক্রমায় কত কিছু যে কক্ষপথ থেকে ছিটকে গেছে কে তার হিসাব রাখে। কিন্তু বাঙালির ঐতিহ্য নিয়ে একটি পুস্তিকা বা ছোট্ট বই কিন্তু টিকে আছে আজও প্রায় সমান গরিমায়। সাধারণ মানুষ আর কোনও বই কিনুক বা না কিনুক, প্রতি বছর নববর্ষের সময় সেটি কিনবেই। হয়তো ক্রেতার সংখ্যা তুলনামূলক কমেছে, তবুও এর সঙ্গে আজও সম্পৃক্ত বাঙালি জীবনের একটা বড় অংশ। বইটি ছাপা হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে একই রকম মলাটের ভিতর, একই রকম সস্তার কাগজে, অক্ষরে আর কালিতে। ফুল হোক বা হাফ, অতি পরিচিত সেই পঞ্জিকা বা পাঁজি নেই এমন বাঙালি পরিবার খুব কমই আছে।

প্রয়োজন ছাড়াও একসময় পঞ্জিকা ছিল কিছুটা সময় কাটানোর আর কিছুটা এক অজানা রহস্যময় জগতের অমোঘ হাতছানি। অন্তত যতদিন পর্যন্ত না পরিপূরক বই বা অন্যান্য মাধ্যমগুলি সহজেই হাতের কাছে এসে যাচ্ছে। তার আগে পাঁজির ব্যবহারিক দিকগুলি দেখে নেওয়া যেতে পারে। শুভ-অশুভ দিনক্ষণ, তিথি, লগ্ন, বিধি-বিধান, ধর্ম-কর্মের নির্ঘণ্ট ইত্যাদি জানার জন্যই পঞ্জিকার ব্যবহার। একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমার দিনক্ষণ আগেভাগে জেনে নিতে চাইতেন বাড়ির বয়স্ক সদস্যেরা। চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ কবে কখন হবে, অন্যান্য পুজো ইত্যাদি নানাবিধ অনুষ্ঠানের দিন এবং সময় জেনে নিয়ে সেইমতো আয়োজন করা তো ছিল প্রচলিত রীতি। এছাড়াও পাঁজিতে প্রথমেই পরিবারের কর্তাটি দেখে নিতেন আরও কয়েকটি ঘোষণা এবং ভবিষ্যৎ বাণী। সারা বছরের জন্য গ্রহগুলির মধ্যে কে রাজা, কে মন্ত্রী, কেই-বা জলাধিপতি আর শস্যাধিপতি, কত আঢ়ক জল, তার কতই-বা সমুদ্রে আর কতটাই-বা পর্বতে এসব জেনে একটা ধারণা করে নিতেন যে বছরটা কেমন যাবে। পড়ে নিতেন ভারতের ভাগ্য, নিজেদের রাশিফল ইত্যাদি। যতই অনেকে বলুন যে তাঁরা আধুনিক, কোনওরকম গোঁড়ামিই মানেন না, তবু বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন-ভিতপুজো-গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি শুভ দিনগুলি জানতে ভরসা সেই পঞ্জিকাই। তার নির্দিষ্ট দিনগুলির বাইরে যেতে পারেন না কেউই। এখানেই বইটির বিপুল সার্থকতা। আর সেই সূত্রে বাঙালির মনে গেঁথে আছে অতি পরিচিত কয়েকটি নাম। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, পি এম বাগচী, বেণীমাধব শীল, দৃকসিদ্ধ মত অনুসারে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ইত্যাদি।

সামাজিক ইতিহাসের দিকটি দেখলে সে-যুগের পঞ্জিকায় ছাপা বিষয়গুলি এবং বিজ্ঞাপনগুলি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও মনে করা হয় কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় কৃষিকাজের শুভাশুভ দিনক্ষণ এবং তার সঙ্গে আরও কিছু ভালো-মন্দের ভবিষ্যৎ বাণীর জন্যই পঞ্জিকার জন্ম, কিন্তু পরবর্তীকালে আরও অনেক বিষয় যুক্ত হয়েছে এই বইতে। প্রচলিত মতে, বই আকারে পঞ্জিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে। সেই হিসাবে এখন পঞ্জিকার দুশো বছর পূর্ণ হল। কী না আছে পাঁজিতে! বিভিন্ন ধর্মের উল্লেখযোগ্য উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বিখ্যাত মনীষীদের জন্মদিন সহ উল্লেখ, গঙ্গায় জোয়ার-ভাঁটার সময়, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ, ডাকটিকিটের দাম, বিভিন্ন পুজো ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের যাবতীয় খুঁটিনাটি সব। এছাড়া মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তোয়াক্কা না করে কোন দিন কী খাওয়া যাবে না যাবে তার পরামর্শ, শরীরের কোন দিকে টিকটিকি পড়লে কী হয়, হাঁচি-কাশি-সর্দির নিদান আর নানান রকম বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনগুলি পাঁজির একটা আকর্ষণীয় দিক। স্বাস্থ্যের জন্য সালসা, বিশাল রাক্ষুসে মুলো, গ্যারান্টি যুক্ত বাতের তেল, 'দন্ত শক্ত রাখিবার অব্যর্থ মহৌষধ', বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি ইত্যাদির সাবধানবাণী- এসব নিয়ে পঞ্জিকার পাতাগুলি জমজমাট।

এগুলি অপ্রয়োজনেও মানুষকে টেনেছে বারবার। একসময় ছিল যখন অলস দুপুরে কিছু করার নেই তো একটু পাঁজিটি নিয়ে বসা যাক। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধির কিশোরবেলার কাছে তার

আকর্ষণ ছিল অন্যরকম। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শুদ্রবর্ণ নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যাত্রা- মধ্য পশ্চিমে নিষেধ রাত্রি ১১/১১ গতে যাত্রা শুভ। বারবেলাদি- ঘ ৮/৩৪ গতে ১১/৪৪ মধ্যে। এরকম ভাষাগুলির সবটা বোঝা না গেলেও সেগুলি মাঝে মাঝে পড়ে দেখতে মন চাইত। তাছাড়া অম্বুবাচি কবে কিংবা পরবর্তী অমাবস্যা পূর্ণিমা বা একাদশী কবে লাগছে বয়স্কদের সেই প্রশ্নগুলির জন্যও মাঝে মাঝেই বের করে আনতে হতো পাঁজি। তখনই চোখ চলে যেত সেইসব বিজ্ঞাপনের পাতায় যেগুলি তখনও পর্যন্ত কিশোর বা তরুণদের কাছে ছিল নিষিদ্ধ এবং তার ফলে তা ছিল আরও বেশি কৌতূহলের। তন্ত্রসাধনা, বশীকরণ ইত্যাদি ছাড়িয়ে চোখ তখন 'গুপ্তজ্ঞান', 'বিবাহের পরে'-এর মতো প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিশেষ বইগুলির বিজ্ঞাপনে, সবাইকে লুকিয়ে। এক অজানা জগতের কিছুটা আন্দাজ নিতে চেয়ে। তাছাড়াও একদল তরুণ যুবা অপেক্ষা করত কখন নতুন পঞ্জিকা বেরবে। তাতে থাকবে স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নতুন নাটকের বইয়ের বিজ্ঞাপন। সেই বই আনিয়ে শুরু হয়ে যেত নাটকের রিহার্সাল।

বিভিন্ন পথে পঞ্জিকা ঢুকে গিয়েছিল মানুষের জীবনে আর জড়িয়ে ছিল তার রোজনামচায়। সেরকমভাবে না হলেও এখনও তার প্রভাব কিছু কম নয়। তাই ১৪২৫-এর বৈশাখে যদি ১৪২৬-এর জ্যৈষ্ঠমাসে কোন বিয়ের দিন ঠিক করতে হয় আগেভাগে পছন্দের ম্যারেজ হল বুক করার জন্য, তাহলে কালীঘাট পাড়ায় গিয়ে পঞ্জিকার অফিস থেকে বিশেষ মূল্যে শুধু সেই মাসের বিয়ের তারিখগুলির একটি তালিকা কিনে আনতেই হবে। আসলে পঞ্জিকা শুধু একটি বই মাত্র নয়, একটা চলমান সংস্কৃতি, একটা আইডিয়া।

আড়াল থেকে

কালবোশেখি আসুক আর না আসুক গ্রীষ্মকাল সমাগত!

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

প্রতীক্ষা এক অদ্ভুত রকমের প্রচ্ছন্ন আবেগ। আর সে যদি অনিশ্চিত প্রতীক্ষা হয় তবে উথালপাথাল। চৈত্র-বৈশাখ মাসের অপরাহ্নিক ঝড়, ঈশান কোণে কালো মেঘ জড়ো হওয়া আর সেই নিকষ কালো ঘুটঘুটে ঘন মেঘ— এদের সমন্বয়ে যদি শান্তিধারা নামে তাহলে বাঙালির বছরের প্রথম বরফ কুচি ছড়ানো আমপানায় কে যেন জল ঢেলে দেয়। আচমকা বহু কাঙ্ক্ষিত নাভিশ্বাস আবার সর্বনাশ!

দুপুর থেকেই ছমছমে আকাশ, গুমরে মরছিল। তারপরেই কালভৈরব ঝড়ের তাণ্ডব আর কিছু পরেই শান্তির ধারাবর্ষণ। এ যেন প্রকৃতির লীলাখেলা। সবুজ আর সজীবের প্রাণ ফিরে পাওয়া। দরজার পাল্লা পড়ছে, জানলার কাচ ভাঙছে। কত শব্দ। আর সবচেয়ে দাপট দেখায় শালপ্রাংশু বৃক্ষগুলি। একবার আটকে গেছিলাম চিলেকোঠায়। নীচে নামতে না পেরে দু-চার লাইন কাব্যি করেছিলাম। কবিতার নাম দিয়েছিলাম কালবোশেখি। অকালবোশেখির মতো আমার কাছে সব কালবোশেখিই যেন বড় অকালে আসে। তাকে বুঝতে না বুঝতেই সে এসে চলে যায় দুমদাম পা ফেলে।

এখনও কালবোশেখির স্মৃতিমেদুর বিকেলগুলোয় চোখ বুজলে কিউটিকিউরা পাউডারের হালকা গন্ধ পাই। গা ধুয়ে নরম ছাপা শাড়ি পরে মায়েদের দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেই মাদুর নিয়ে ছাদ-সংসার পাতার তোড়জোড়। মায়ের হাতে একটা হাতপাখা আর অন্যহাতে বাড়িতে পাতা টক দইয়ের ঘোল। ওপরে কাগচিলেবুর সুবাস। ফ্রিজ তখনও ঢোকেনি বাড়িতে। বরফ যেন আমাদের কাছে সোজা হিমালয় পৌঁছনোর মতো ব্যাপার। বাজারের একটা দোকান থেকে সন্ধেবেলা বরফ কিনে এনে শরবত খাওয়া হতো। সেদিন যেন চাঁদ হাতে পাওয়া। তখন 'হিমক্রিম' পাওয়া যেত। সেও যেন এক অতি আশ্চর্য রকমের প্রাপ্তি। মিষ্টির দোকানে আইসক্রিম মিলত। কোয়ালিটির আইসক্রিমের কাপ। কোনও কোনও দিন দুধের বড় ক্যানের মধ্যে বরফ দিয়ে সেই আইসক্রিম আসত গরমের ছুটির বিকেলে। ছাদের ওপর হয়ে যেত আমাদের ছোট্টবেলার আইসক্রিম পার্টি। বাবা একবার সেই আইসক্রিম আনতে গিয়ে কালবোশেখির ঝড়ে পড়লেন। কী চিন্তা আমাদের! যত না চিন্তা মানুষটির জন্য তত চিন্তা আইসক্রিমের জন্য। মা খুব বকুনি দিয়েছিলেন। আগে বাবা না আগে আইসক্রিম, এই বলে।

তখন আমাদের স্কুলজীবনে গরমকালের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল লোডশেডিং। ইনভার্টার ছিল না। রোজ নির্দিষ্ট সময়েই পাওয়ার কাটের পূর্বাভাস পেয়ে যেতাম আমরা। আর কালবোশেখি হলেও ঝড়ের তাণ্ডবে পাওয়ার চলে যেত। তখন দখিনের খোলা বারান্দাই ভরসা। সেখানেই জ্যামিতি, পরিমিতি আর উপপাদ্যে নিয়ে জোর কসরত চলত। সকাল থেকেই হ্যারিকেনে কেরোসিন ভরে, ঝেড়ে পুঁছে রেখে, তার সলতে ঠিকমতো কেটে সমান করে দেওয়া হতো। এখন শিল্পের বাড়বাড়ন্ত অতটা নেই তাই বিদ্যুতের চাহিদাও নেই। অবশ্য বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে শপিং মলে, মেট্রো রেলে। মাল্টিপ্লেক্সে, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে, সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। বিশ্বায়নের স্বীকার আমাদের শহর। আর সেই সঙ্গে আমরাও। তবে

কলকারখানাও নেই বড় একটা, তাই লোডশেডিং মুক্ত আমরা। স্কুলের শিশুরা আরামেই গ্রীষ্মের ছুটির হোমওয়ার্ক করে। হোম মেকারের বাতানুকূল দিবানিদ্রা দিব্য যাপন।

রাতে লোডশেডিং-এ মা টানতেন হাতপাখা। শাড়ির পাড় দিয়ে মোড়া থাকত হাতপাখাটি। টেঁকসই হবে বলে। ছোটদের বেয়াদপির দাওয়াই ছিল এই পাখার বাড়ি। যে খায়নি এই পাখার বাড়ি সে জানেও না তা কেমন খেতে। সেই তালপাতার পাখাখানি টানতে টানতে বাইচান্স আমাদের গায়ে ঠুক করে লেগে গেলেই মায়ের যেন একরাশ মনখারাপ। যেন কী ভুলই না করেছেন। সেই পাখা সঙ্গে সঙ্গে ঠকাস করে মাটিতে ঠুকে তিনবার আমাদের কপালে, চিবুকে হাত রেখে চুক চুক করে ক্ষমা চাইতেন। দোষ কাটিয়ে নিতেন। সন্তানের গায়ে হাতপাখা লেগে যাওয়া যেন দণ্ডনীয় অপরাধ। মাটির কুঁজো বা জালার জল ছিল আরেক প্রাণদায়ী বন্ধু সেই গরমে। মা আবার এক ফোঁটা কর্পূর দিয়ে রাখতেন জালার জলে। জীবাণুনাশক আবার সুন্দর গন্ধ হবে বলে। জলের লীনতাপকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দেওয়ার জন্য সকাল থেকেই লাল শালু ভিজিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হতো মাটির জালার বাইরে। এখন গর্বিত বাঙালির ঘরে ঘরে ফ্রিজ। সে মাটির কুঁজোও নেই আর নেই সেই হাতপাখাও।

এখন সকলে বলে গরম বেড়েছে। কারণ নাকি বিশ্ব উষ্ণায়ন। পরিবেশের নাকি বেজায় দম্ভ। বাড়ির গরম, গাড়ির গরম। সেই সঙ্গে মানুষের মাথাও গরম। টিভির চ্যানেলে অহোরাত্র ঘটি গরম। তাই মেঘ জমে কালবোশেখি হবার আগেই সব মেঘ বাষ্পমুক্ত হয়ে শুকিয়ে যায়। মায়ের এখন থাইরয়েড, তাই গরম আরও বেশি। হোমমেকারের হটফ্লাশ তাই গরম বেশি। বাজারদরের আগুন নেভে না তাই বাবার কপালের ঘাম শুকোতে চায় না। ছেলেপুলেরা জন্মেই ফ্রিজ দেখেছে তাই ফ্রিজে জল না থাকলে তারাও অগ্নিশর্মা। ওরা শিখল মকটেল। পেপসি। বাড়িতে সফট ড্রিংক্স রাখা যায় এসব ছিল আমাদের ধারণার বাইরে। বাড়ীতে পাতা টক দইয়ের ঘোলের স্বাদ ওরা পেল না। কী জানি লোডশেডিং, মাটির জালা, হাতপাখার বাতাস, ছাদে বসে বরফকুচি দেওয়া সীমিত শরবত এগুলোই বোধহয় ভালো ছিল। তাই বুঝি এত গরম অনুভূত হতো না। আর কালবোশেখির প্রতীক্ষাও ছিল না। তিথি নির্ঘণ্ট মেনে ঠিক ঈশান কোণে মেঘ জমে উঠত।

আর কালবোশেখি এলেই কাঁচা আম ঝরে পড়া? ঝড়ে আম কুড়োয় এখনও কোনও দস্যি ছেলে। তবে পথেঘাটে নয়। শিলাজিতের গানেই। এখন ওদের আর রাখাল সাজা হয় না। কারণ তারাও এখন চাপে। তাই ঠাম্মার কপালে ভাঁজ। আমকাসুন্দি বানাতে হবে। আমবারুণীর পুজো করতে হবে না গঙ্গায় গিয়ে? কিন্তু কে কুড়োবে সেই আম! আম পাড়ার নেশা যে কী জিনিস তা যে পেড়েছে সেই জানে। এখন রিয়েল এস্টেটের রমরমায় নেই সেই আমগাছ। নেই সেই আম রাজত্ব। বাজারের কেনা আমে সাধ মেটাও হে!

তাই কালবোশেখি আসুক আর না আসুক গ্রীষ্মকাল সমাগত!

ছো ট গ ল্প

বিনিময়

ভারতী দেবনাথ

শনিবার। দাদার সঙ্গে শিবপুর বিদ্যাসাগর হাইস্কুলের কাছে আসতেই ঝিনুকের চোখে পড়ে, স্কুলের পিছনে একটি পাহাড় গাছপালা বুকে নিয়ে যেন আকাশে হেলান দিয়ে আছে। গেট পার হয়ে ভাই-বোন কমন রুমে ঢোকে। সাগর সকলের সঙ্গে ঝিনুকের পরিচয় করিয়ে দেয়। আলাপচারিতার মধ্যেই ক্লাস শুরু হওয়ার ঘণ্টা বাজে। প্রিন্সিপাল ছাড়া সকলে ক্লাস নিতে চলে গেলেন। ঝিনুক বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দেখে, চারদিকে ক্লাসরুম আর মাঝখানে বিশাল জায়গা জুড়ে গাছপালা। দুটি কোকিল অনবরত ডেকেই চলেছে। ঝিনুক গাছগুলির কাছে এসে মাথা উঁচু করে কোকিলের সন্ধান করে চলে। একসময় প্রিন্সিপাল এসে বলেন, 'ঝিনুক, তুমি এইসব গাছের নাম জানো?'

—না স্যার।

—এই দুটি শিমুল ও পলাশ গাছ। আর এই গাছটি দেখো, একেবারে নীচ থেকে কেমন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বেড়ে উঠেছে, এটা কদম গাছ। কদম ফুল দেখেছ কখনও?

—না স্যার।

—একবার বর্ষাকালে এসো। দেখবে কত বকুলফুল মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে আছে। আর গোল গোল কদমফুল গাছে ঝুলছে।

সময় থেমে থাকে না। আবার ঘণ্টা বাজে। 'ঝিনুক, তুমি এনজয় করো। আমার এখন ক্লাস আছে', বলে তিনি চলে যান। ঝিনুক কদমগাছটা দেখে। মনে পড়ে কৃষ্ণলীলা সিনেমার দৃশ্য। যমুনার তীরে কদমগাছে বসে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাতেন আর রাধার সঙ্গে প্রেম করতেন। কী অপূর্ব প্রেম দুজনের।

— 'অমন হাঁ করে কী ভাবছেন?' শ্যামল ঝিনুকের পিছনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতেই সে চমকে ওঠে। এতক্ষণ সে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কথা ভাবছিল বলে মনে মনে লজ্জা পায়। মাথা নেড়ে বলে, 'কই, কিছু না তো। গাছটা দেখছিলাম।'

—শুধু দেখছিলেন? কিছু ভাবছিলেন না?

ঝিনুক ভাবে, শ্যামল স্যার কী মনের কথা পড়তে পারেন? সে চোখ তুলে দেখে শ্যামল তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। পুরুষের চোখের দৃষ্টি পড়ার মতো বয়স ঝিনুকের হয়েছে। তবে সেও কম যায় না। শ্যামলের চোখে চোখ রেখে বলে, 'এই গাছটা দেখলে, আপনি কি কিছু ভাবেন?'

—আমার তো গাছটা দেখলেই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কথা মনে পড়ে যায়।

ঝিনুক পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্যামলের দিকে তাকায়। গাত্রবর্ণ শ্যাম হলেও, তার উন্নত ললাট, বাঁশির মতো নাক, বড় বড় চোখ, সর্বোপরি তীক্ষ্ণ চিবুক ঝিনুকের মনকে আকৃষ্ট করে। ইচ্ছে করে দু-চোখ ভরে দেখে। একেই কী বলে, প্রথম দর্শনে ভালোবাসা? ঝিনুকের মনে কি ভালোবাসা জন্মেছে? ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠতেই ঝিনুক লজ্জায় চোখ নামিয়ে মোবাইল দেখে বলে, 'একটা বাজে'। তার রক্তিম মুখের দিকে তাকিয়ে শ্যামল বলে, 'আপনার মোবাইল নম্বরটা পেতে পারি?' ঝিনুক বলে, 'শিওর'।

দুজনে মোবাইল নম্বর বিনিময় করে।

সাগর ঝিনুককে নিয়ে স্কুল থেকে বের হতেই শ্যামল কাছে এসে বলে, 'সাগরদা, আমাদের বাড়ি চলুন, প্লিজ। মা খুশি হবেন।'

সাগরের মনটাও এটাই চাইছিল। একদিন শ্যামলের বাড়ি গিয়ে তার দিদি কণিকাকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল। আজ গেলে আরেকবার দেখতে পাবে ভেবে ঝিনুককে বলে, 'এতো করে যখন বলছে, চল যাই।'

দুজনকে বসার ঘরে বসিয়ে শ্যামল 'আমি মাকে খবর দিয়ে আসি', বলে চলে যায়। ঝিনুক বড় বড় চোখ করে দেওয়ালের ছবিগুলি দেখতে থাকে। সাগর বলে, 'এ সবই শ্যামলের দিদি কণিকার আঁকা। ভালো না?'

—অসাধারণ। কিন্তু তুই কী করে জানলি?

—একদিন শ্যামলের সঙ্গে এসেছিলাম।

—কণিকাদিকে দেখেছিস?

এমন সময় কণিকা ঘরে ঢুকে বলে, 'এতদিনে আমাদের মনে পড়ল সাগরদা? এই বুঝি ঝিনুক?'

—হ্যাঁ, আমিই ঝিনুক। আর তুমি তো শিল্পী কণিকাদি। তোমার ছবিগুলি যেমন সুন্দর তেমনি তুমিও সুন্দর।

ঝিনুক হেসে বলে, 'বাবা, একেবারে পাকা বুড়ি। চলো, মা তোমাকে দেখতে চাইছেন।' বলে কনিকা ঝিনুকের হাত ধরে নিয়ে যায়।

— 'মা, এই ঝিনুক', শয্যাশায়ী বিনিতার সামনে এসে কনিকা বলে।

'বোসো মা', বলে বিনিতা উঠে বসে ঝিনুকের হাত ধরে নিজের পাশে বসান। ঝিনুকের চিবুকে হাত দিয়ে বলেন, 'বাঃ, কী মিষ্টি মেয়ে। ভাই, বোন যেন একই ছাঁচে গড়া।' গ্রাম-বাংলার মানুষ, দুপুরে অতিথিনারায়ণের সেবা না করে ছাড়লেন না। ভাত খেয়ে, একটু বিশ্রাম করে তবেই সাগর, ঝিনুক ছাড়া পেল।

তারপর দুটি বসন্ত পার হয়ে গেছে। ঝিনুক বিএ পড়ছে। বার কয়েক শ্যামল কলেজে দেখা করে গেছে। মোবাইলের মাধ্যমেও চলে দুজনের প্রেমালাপ। ঝিনুকের বুকে ভালোবাসার মুক্তোটি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হতে থাকে।

গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। একদিন পরিকল্পনামতো ঝিনুক, শ্যামল বালাজি মন্দিরে আসে। বালাজিকে প্রণাম করে ঝিনুক দশ টাকা দক্ষিণা দেয়। শ্যামল একশো টাকা দিয়ে প্রণাম করতেই এক সাধু শ্যামলের হাতে ইয়া বড় একটি বোদের লাড্ডু দেন। বাগানের নিরিবিলি স্থানে বসে দুজনে লাড্ডু ভাগ করে খেতে থাকে। ঝিনুক বলে, 'দেখলে টাকার খেলা! দশ টাকা দিয়েছি বলে আমায় একটু প্রসাদও দিলেন না। আর তুমি একশো টাকা দিতেই এত বড় লাড্ডু পেলে!'

—বাদ দাও। যার জন্য তোমায় ডেকেছি। আমার দিদিকে কী করে বিয়েতে রাজি করাই বলো তো! দিদি বিয়ে না করলে যে আমি বিয়ে করতে পারব না।

—অ্যাক্সিডেন্টে বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর দাদা আমাকে মানুষ করেছেন। দাদাকে সংসারী না করে আমিও বিয়ে করতে পারব না শ্যাম।

—সমস্যার কি সমাধান নেই?

ঝিনুকের মাথায় একটি পরিকল্পনা আসে। শ্যামলকে বলতেই সে হেসে বলে, 'সামনের রবিবারেই ট্রাই করব।'

—ঠিক আছে। এবার ফিরতে হবে শ্যাম। শ্যামল ঝিনুকের ডান হাতে একটা চুমু দিয়ে বলে, 'আই লাভ ইউ।'

—আই লাভ ইউ টু।

সিনেমা হলে ঢোকার সময় ঝিনুক সাগরের হাতে একটা টিকিট দিয়ে বলে, 'দাদা, তুই বস গিয়ে। আমি ওয়াশরুম থেকে আসছি।' সাগর অন্ধকার ব্যালকনিতে ঢুকতেই একজন টর্চের আলোয় টিকিট দেখে তাকে পিছনের সারিতে বসিয়ে দেয়। সাগর বোঝে, তার ডানদিকের সিটটা খালি। বাঁদিকে যে একজন মহিলা, তা শাড়ির খস খস আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে। 'হাম সব সাথ সাথ হ্যায়' ছবিটা আরম্ভ হতেই ডান দিকের সিটে একটি ছেলেকে বসিয়ে দেয়। বেশ মজার বই। ক্ষণে ক্ষণে হলে হাসির বৃষ্টি। সাগর হাসবে কি! বইটাতেই মন দিতে পারছে না। বাঁ পাশ থেকে আনবরত ফ্যাঁচ, ফ্যাঁচ আওয়াজ আসছে। সাগর শুনেছে ভূতেরা নাকি সুরে কাঁদে, হাঁসে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে তার গায়ে কাঁটা দেয়। চোখ বন্ধ করে রাম রাম জপ করে।

ইনটারভেল হতেই সাগর চোখ খুলে বাঁ পাশে তাকাতেই , সত্যি ভূত দেখার মত চমকে উঠে বলে, 'আপনি?'

—একি, আপনি?

একই দিনে দু-বাড়িতে ফুলশয্যা। কণিকা সাগরের বুকে মাথা রেখে বলে, 'জানো সাগর, প্রথম যেদিন তুমি আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে, সেদিনই আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। তাই, কোনও সম্মন্ধ এলে, আমি মত দিতাম না।'

—সেদিন আমাদের দুজনের মনেই ভালোবাসা জন্মেছিল। সেদিন ছিল বসন্ত পূর্ণিমা।

নীলাভ আলোয় ঝিনুকের মুখ চুম্বন করে শ্যামল বলে, 'অবশেষে সাগরদার সঙ্গে দিদির বিয়ের বিনিময়ে তোমার আমার বিয়েটা হয়ে গেল।'

—হি-হি-হি। সেদিন দাদা বাড়ি ফিরে আমাকে বলেছে, শ্যামকে ভালোবাসিস?

—তুমি কী বলল?

—বলব কেন।

—তবে রে...!

অলংকরণ: পার্থ দেবনাথ

কবিতা

গোপন ঘর
দিব্যেন্দু শেখর দাস

কালরাত্রি যাপনের শপথ নিয়ে
দুর্গম পাহাড়ের বুক চিরে হেঁটে চলি
যখন আমি একা
পানকৌড়িদের জলকেলি দেখে
অতীত ভিড় করে গোপন ডেরায়।

সচেতন ভ্রমণের টিকিট চাইতেই
আমি যত্র তত্র আবর্জনা মাখি
চেনা পর্যটক চেনা— পথ বহুকাল এ-পথে পা বাড়ায়নি
ভ্রমণ সংবাদ আসতেই শীতঘুম ভেঙে অচেনা রং গায়ে মাখি
অতিথিশালার বুক ফুটো হয়ে জল জমেছে
ঘরে আলো জ্বলেনি, আগাছা বাসা বেঁধেছে অনেকদিন।

ঠিকানা হারিয়ে গেলে
মধুসূদন ঘাটী

ঠিকানা হারিয়ে গেলে মাঝে মাঝে এরকম হয়,
ভুল রাস্তা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে, ভুল পরিচয়পত্র
থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চেনা মুখ, ব্যাকুল সময়।

ঠিকানা হারিয়ে গেলে এরকম হয় মাঝে মাঝে,
দিনের মহিমা খুঁজি লাজুক চাঁদের কাছে অলিখিতভবে
বাকধর্মী আমিই লুকিয়ে পড়ি মুখের কোলাজে।

ঠিকানা হারিয়ে গেলে সর্বংসহা দুঃখকে ডাকি,
ঠিকানা হারিয়ে গেলে পথ খুঁজি রাতের জোনাকি।

শিকড় ছেঁড়া
প্রিয়াঞ্জলি দেবনাথ

ক্রমশ মাটি থেকে চাঁদ উঠে আসে
কাদাজলে ভাসে সকালের আলো—
নিজস্ব যুগ পার করে দূরে
বিনয়ী যুগের দিকে সরে যায়
নিখাদ বিশ্বস্ত কলঙ্কের দাগ...

ক্রমশ দূরে সরে যাও তুমি—
ফিকে হওয়া ভেষজ জামার গন্ধ
কালো হাসের উসকুখুসকো ঝাঁক
আর সোনালি নদীর খাদ,
দূরে সরে যায়
আমাদের ভেতরকার সমস্ত অরণ্য...

বাঁশের খুঁটি ছুঁয়ে বারান্দা পেরোতেই
দরজা,
দরজার চৌকাঠ ছুঁয়েই অন্দরমহল
যার ভেতর আলো নেই, অন্ধকার নেই
আছে শুধু পোড়া কাঠের ধোঁয়া—
এক অচেনা নিঃসঙ্গ গভীরতা...

ক্রমশ তলিয়ে যাই আমি
ভেজা কাঠের স্যাঁতা গন্ধে,
তুমি তখন দূরে সরে যাও—
মাটি থেকে চাঁদের গায়ে
রুক্ষ নদী ধরে ছড়িয়ে পড়ো বাগানময়

আমরা তখন পরস্পরের আরও দূরে,
বস্তুজগতের সব আলো মেখে
লাল-নীল-বেগুনি ঝাঁকে
গোধূলিদিনের সমাধি খুঁড়ি
খই ছড়াই উঠোন জুড়ে;

এইভাবে পাথর ভেঙে চাঁদ ডুবে যায়
হৃদয় ছিঁড়ে এক-একটা
জন্ম খসে পড়ে...

মাটি থেকে অনেক দূরে
তুমি তখন হৃদয়পাতে মাতো

এইভাবে ক্ষয়ে যাই আমরা
নতুন করে শিকড় ছেঁড়ে রোজ ...

রবিবারের বৈঠক

যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ৬ মে ২০১৮

ইউনিকোড হরফে লিখে জানান রবিবারের বৈঠক সম্পর্কে আপনার মতামত। সেরা মতামতটি প্রকাশিত হবে 'বৈঠকের বিশেষ পাঠক' বিভাগে।

ধা রা বা হি ক প্র ব ন্ধ

বাংলা ছোটগল্পে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন: সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম

কার্তিককুমার মণ্ডল *গবেষক,*
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

(গত সপ্তাহের পর)

১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গুর আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। সেদিন সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়ায় পুলিশ-পাহারাদারদের ঘেরাটোপে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের কর্মী মনোরঞ্জন মালিকের একমাত্র কন্যা কিশোরী তাপসী মালিককে হত্যা করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ধর্ষণ-হত্যা ও মৃতদেহ পুড়িয়ে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ ওঠে পুলিশ-পাহারাদারদের দিকে। এই ঘটনায় সিঙ্গুরের প্রতিবাদী আন্দোলনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এ-প্রসঙ্গে প্রোফেসর স্বপনকুমার মণ্ডলের কথা প্রণিধানযোগ্য, '১৮ ডিসেম্বর আন্দোলনে সামিল হওয়া কিশোরী তাপসী মালিক ধর্ষিত হয়ে রেহাই পায়নি, প্রমাণ লোপাটের শিকারে জীবনদীপ নেভাতেও বাধ্য হয়। অবশ্য এই নৃশংস হত্যালীলাই অনিচ্ছুক কৃষিজীবীদের যেমন আরও বেশি সক্রিয় করে তোলে, তেমনই জনসমর্থনের পরিসরকে বিস্তৃত করে'। একথা ঠিক যে তাপসী হত্যা সিঙ্গুর আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে। সারা বাংলা ও বাংলার বাইরে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক তথা সমাজকর্মী মহাশ্বেতা দেবী সেই প্রেক্ষিতে লিখেছেন, 'এখন তাপসী সিঙ্গুর হয়ে গিয়েছে, সিঙ্গুর কোনও ভূখণ্ডের নাম নয়, তাপসীই আজ সিঙ্গুর।' স্বাভাবিকভাবে সেই ঘটনার (তাপসী হত্যা) প্রতিফলন বাংলা ছোটগল্পেও আমরা লক্ষ করি। জয়ন্ত পাঠক তাঁর 'মাঝনদী'('উবুদশ', মার্চ ২০০৯) গল্পে সিঙ্গুরের তাপসী হত্যার প্রসঙ্গ এনেছেন সরাসরিভাবে। জমি অধিগ্রহণের প্রেক্ষিতে ক্লাস সিক্সের মেয়েও রাতারাতি বড় হয়ে যায়, তা গল্পকার দেখিয়েছেন 'কণি'র মধ্য দিয়ে। পুনি বুড়ির সংলাপে তাপসী হত্যা প্রসঙ্গ এইভাবে চলে আসে, 'তোর কীসের এত ছটপটানি মেয়েছেলে হলে কী হয় দেখলি না? ওদের কাছে আর মা-মাসি কেউ নয়। সধবা, বিধবা, কুমারী মেয়ে হলেই হল, যা যা ঘরে যা।' তেমনই নিধির কথাতেও তাপসী এসেছে, 'মেয়েটাকে একেবারে শকুনের মতো ছিঁড়ে অত্যাচার করে, পুড়িয়ে দিলো? টিভি, কাগজ, মিটিং, পুলিশ... কী হল? মেয়েটাকে মা-বাবা ফিরে পেলো? রোজ ভোরে, ওর মা'টা কাঁদে- তাপসী রে... ওমা রে... তাপু মা ... ওই ডুকরে কান্না যেন সহ্য করা যায় না।' এই ঘটনার অভিঘাত ছোটদের ওপরেও পড়েছে তাই গল্পের কবি দাদুর মনে হয়েছে, 'টাটা কোম্পানির মোটর কারখানা যা-ই পারুক আর না পারুক, ছোটদের বড় করে দিয়েছে।' তাই ছোটরা নিজেরাই তাপসী'কে নিয়ে পালা বানিয়ে রিহার্সাল দিচ্ছে। তাপসী মরেও বেঁচে উঠেছে বারে বারে সিঙ্গুর আন্দোলনের মাঝে। এই গল্পে কবি দাদুর সংলাপে উত্তাল সত্তরের দশকের কথাও ছবির মতো ফিরিয়ে এনেছেন গল্পকার। কোথায় যেন সিঙ্গুর আর নকশালবাড়ি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় দাদুর চেতনায়।

অন্যদিকে, গল্পকার তৃপ্তি সান্ত্রা তাঁর 'ছাতিয়ানতলার দিকে' (শারদীয় বারোমাস, ২০০৭) গল্পটিতে তাপসী মালিককে সরাসরি উপস্থাপন করে গল্পে নতুন মাত্রা এনেছেন। যদিও তাঁর গল্পটি শিল্পায়নকে নিয়ে লেখা নয়। নদীর ভাঙনে পীড়িত গরিব ঘরের শিক্ষিত মেয়ে রুলেখার আধুনিক ভাবনায় তাপসী মালিক জীবন্ত হয়ে ওঠে। সে তাপসী হত্যার রায় শোনার জন্য রেডিওর খবরের দিকে মুখিয়ে থাকে। আত্মহত্যা নয় খুন বলেই রায় দিয়েছে কোর্ট এ কথা জেনে আশ্বস্ত হয় রুলেখা। গল্পকার অত্যন্ত সুকৌশলে রুলেখার জীবনে তাপসীর ভূমিকাটি তুলে ধরেছেন। ৯৮' এর ভাঙনে আলাদিটোলায় বাড়ি তলিয়ে যাবার পর বাঁধের উপর বসবাসের সময় পায়খানা করার করুণ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাপসী মালিকের উপস্থিতি সচেতন পাঠককে সজাগ করে তোলে, বাড়ি ভর্তি লোক থাকলেও একা একা মাঝরাতে বা ভোর রাতে পায়খানা যায় না। ভয় লাগে। তাপসীর মৃত্যুটা খুব নাড়া দিয়েছিল তাকে। নির্জন মাঠে একা একা শরীর ঝাড়তে যেতে হয় মেয়েটিকে আর কী নৃশংসভাবে মারা যায়। পেট পোড়ে, উরু পোড়ে, লজ্জার স্থান পোড়ে- মুখ পোড়ে না। মুখ পুড়লে তো চেনা যাবে না। চেনানো দরকার। যারা গলা ওঠায়, দাবি করে তাদের চিনে রেখে শাস্তি দিতে হয়'। এভাবে গল্পে তাপসী মালিককে তুলে আনায় গল্পকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তেমনই দেখি তৃপ্তি সান্ত্রার গল্পের মতোই মধুময় পালের 'সেই মেয়েটা জ্বলছে' ('উবুদশ', নভেম্বর ২০০৯) গল্পটিতে তাপসী মালিক প্রসঙ্গ এসেছে। গল্পকার নাম না করলেও তাপসী যেন চুপি চুপি হাজির। তাই গল্পে দেখি বিপ্লার মনে প্রশ্ন, একটা মানুষ পুড়ছে। পুরুষ না নারী বোঝার উপায় নেই। উপুড় করে ফেলা হয়েছে। দাহের পদ্ধতি এটা নয়। এটা পোড়ানো হচ্ছে। ... চিত করে দাহ করার মধ্যে একটা সম্মান দেওয়ার ব্যাপার থাকে। পুড়ে পুড়ে বেঁকে যাওয়া, ফাট্ ফাট্ শব্দে আরও পুড়তে থাকা মেয়েটা কী করেছিল?' আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এ মেয়ে জমি কমিটির তাপসী মালিক।

জোর করে জমি অধিগ্রহণে অনেক কৃষক পরিবারে নেমে আসে অন্ধকারে কালো ছায়া। এর ধাক্কা সইতে না পেরে অনেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ১২ মার্চ ২০০৭ হারাধান বাগ নামে সিঙ্গুরের এক কৃষক আত্মহত্যা করেন। সে প্রসঙ্গও ছোটগল্পের আধারে উঠে এসেছে। সিঙ্গুর প্রভাবিত গল্পগুলির মধ্যে নিমাই ঘোষের 'লাশকাটা ঘরে'('উবুদশ', মার্চ ২০০৯) গল্পটি বাস্তবধর্মী কল্পগল্পের নমুনা। জমি হারানো হারাধন আত্মহত্যা করলে তার সঙ্গে মর্গে দেখা হয় সেখানে ঘুমিয়ে থাকা তাপসী (তাপসী মালিক) ও রাজকুমারের (রাজকুমার ভুল) সঙ্গে। ওদের সঙ্গে একই মর্গে ঠাঁই পেয়েছে সন্তোষ। তার কথায় সরাসরি এসে যায় বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসনের কথা। জমি হারানো সন্তোষ আশায় ছিল কোর্ট কিছু করবে। তাই সে বলেছে, ... এতদিন হয়ে গেল, কোর্টও তো তেমন রায় দিল না। আমার ঘরে খাবারও ফুরিয়ে আসছে। এবার কী খেতে দেবো, কী ক'রে একটু লেখাপড়া শেখাবো, রোগ হলে চিকিৎসা করাবো কীভাবে— এমন সব সাত-পাঁচ ভাবনায় মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, তাই দুম ক'রে বাঁচতে ইচ্ছে করলো না।' সন্তোষের কথায় উঠে এসছে নন্দীগ্রামের সেই প্রসঙ্গও। গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন মর্গে তাপসী মনের জ্বালা নিয়ে বসে থাকাতেও তার লড়াকু মানসিকতার বিন্দুমাত্র টাল খায়নি। তাই সে বলেছে, 'আসলে লড়াইটা যদি ধরে রাখতে পারে তাহলে যতই পাঁচিল দিক ওখানে ওরা কারখানা করতে পারবে না। আসলে শুধু প্রতিবাদ করে কিছু হবে না, এবার সত্যিকার লড়াই চাই, যে লড়াইয়ে রক্ত ঝরবে, অনেক প্রাণ যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হবে আমাদের'। গল্পকার কল্পনার ডানায় ভর করে সিঙ্গুর আন্দোলনের দুই শহিদ তাপসী মালিক ও রাজকুমার ভুল এবং টাটার জন্য জমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যাকারী দুই কৃষক হারাধন বাগ ও সন্তোষের কাল্পনিক কথোপকথনে সিঙ্গুর প্রসঙ্গ তুলে ধরলেও গল্পটির গল্প রস দানা বাঁধেনি। তবুও একটি জলন্ত সময়ের অসমাপ্ত দলিল হয়ে গল্পটির বিষয়বস্তু আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক।

(চলবে)

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

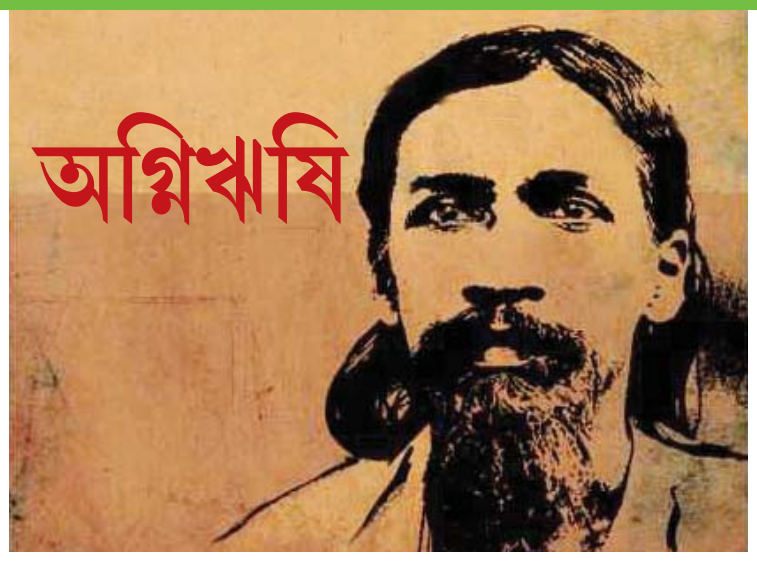

অভিজিৎ চৌধুরী

(গত সপ্তাহের পর)

এই সময় ফটিক বলে একজন ফাজিল ছেলে এসে জুটল। পুলিশ একে বাড়ির কলতলা থেকে তুলে এনেছে। ফটিক একটা ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য তখন সবে নাইতে গেছে।

ফটিক বলল, 'বারীনদা, তবে তো বড়লোক হয়ে গেলেন। দিস্তে দিস্তে টাকাও আসতে লাগল।'

বারীনদা বললেন, 'যুগান্তর জন্মাল কিন্তু অকূল সিন্ধুর আবর্তে ঝাঁপ দিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মীর উদয় হল না। অবি আর আমি একটা ঢাকাই পরোটা দুজনে ভাগ করে খেয়ে রাতের পর রাত কাটিয়েছি। বামুন রেখে হাঁড়ি চড়তে বিলক্ষণ বেশ কিছুদিন লেগেছিল।'

বিপুল বলল, 'তারপর সেই বখাটে ছেলেটা এসে জুটল।'

বারীন বললেন, 'আর বলিস না— গুপ্তসমিতির নাম করে সে তখন গোলদীঘিতে কনস্টেবল ঠ্যাঙাচ্ছে। গরীব ট্রাম কন্ডাক্টরের টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিচ্ছে। সবটাই আত্মসাৎ করত নিজে বিপ্লবীদলের নাম করে। জঘন্য চরিত্র। সে তার স্যাঁঙাতদের নিয়ে এসে একদিন 'যুগান্তর' অফিসে হানা দিল।'

হেমচন্দ্র কখন উঠে এসেছেন বারীন টের পাননি।

হেম বললেন, 'তারা সব বিপিন পালের সঙ্গে ঝগড়া করে তোমার কাছে এসেছিল।'

বারীন এবার টের পেলেন হেম কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বাংলায় তখন প্রথম শিবাজি উৎসব হয়। তিলক এসেছিলেন। সুরেন ব্যানার্জি তিলককে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় করান।

হেম বললেন, 'বিপিনবাবু চরমপন্থী আন্দোলন সমর্থন করতেন।'

বারীন বললেন, 'তিনি মুখে বিপ্লবী ছিলেন কাজে নন।'

হেম নিস্পৃহ গলায় বললেন, 'অনেকেই তাই। তোমার সেজদা যেমন সুযোগ বুঝে সন্ন্যাস নিচ্ছেন।'

বারীনের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

অন্য সময় হলে বারীন রেগে যেতেন। আজকে বেশ সংযত আচরণ করলেন।

—তুমি কী বলতে চাইছ?

হেম বললেন, 'প্রিজন ভ্যানে উঠতে উঠতে তুমি বলেছিলে— My Mission is over. তার মানে কী?'

—আমরা কিছুই তো করতে পারিনি।

বারীন হেসে বললেন, 'মহাকাল এর জবাব দেবেন।'

বিরক্তি ফুটে উঠল হেমচন্দ্রের মুখে।

—আমি সমকাল বুঝি। আমাদের এই প্রয়াস হাস্যকর। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল— সবাই তো ব্যর্থ হল।

বারীন বললেন, 'তুমি ব্যর্থ কেন বলছ? আজ যদি উল্লাসের ফাঁসি হয় সে তো হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করবে। মৃত্যুভয় থেকে আমরা উত্থিত হওয়ার প্রেরণা আমরা দিয়ে যাচ্ছি।'

হেম বললেন, 'পুব বাংলায় ফুলার যখন বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ করলেন এবং এপ্রিল ১৯০৬, সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, ভূপেন্দ্রনাথ বোস, উপাধ্যায় পুলিশের হাতে চরম নিগৃহীত হলেন, আমি তখনই প্যারিস যাওয়ার কথা ভাবলাম।'

বারীন বললেন, 'তুমি আমাকে অভিযুক্ত করতে চাইছ?'

হেম বললেন, 'অবশ্যই। বোমা তৈরির প্রযুক্তিটা তুমি জানতে না। তুমি জানো কথার ফুলঝুরি। ভারতের নেতা হওয়া তোমার বাসনা। শিলং, বরিশাল, রংপুর— যেখানেই গেছ তুমি যুগান্তরের অলৌকিক কীর্তিগাথা বহন করেছ।'

তোমার সেজদার নির্বাচন নরেন গোঁসাই। আমরা তো দেখলাম এর অপরিণামদর্শিতা।

বারীন বললেন, 'এখন আমাদের মুক্তি পেতে হবে। উকিলকে সাহায্য করতে হবে। নরেনকে সেজদা চিনতেন না।'

হেম আরও রেগে গেলেন।

উকিল লড়বেন অরবিন্দবাবুর জন্য। তিনি মহান আধ্যাত্মিক নেতা।

বারীন বললেন, 'সেজদার মতো মানুষকে বোঝা তোমার সাধ্যের অতীত।'

হেম বললেন, 'আমি তাঁকে বাস্তবের পটভূমিতে ফেলে বিচার করব। স্বদেশিরা ডাকাতি করেও অর্থ সংগ্রহ করবে— অরবিন্দবাবু এবং গুপ্ত সমিতি অনুমোদন করল। তুমি বললে সরকারি কোষাগার লুঠ করা যাবে না, কারণ ওতে ভারতে মানুষেরই ক্ষতি হবে। অনেক পাট ব্যবসায়ীও ছিলেন। তারা অজ্ঞাত কারণে আমাদের লক্ষ্যের বাইরে চলে গেলেন।'

বারীন বললেন, 'বাকিটা আমি বলছি। নরেন একজন বিধবার কথা বলল যিনি একা থাকেন। আমরা তাও পারলাম না। পুলিশ খবর পেয়ে গেছিল।'

হেম বললেন, 'তুমি আমাকেও পাঠালে আর নিজে নিরাপদ দূরত্বে বসে রইলে। আর তোমার সেজদা তো মহামানব।'

বারীন বললেন, 'ভাই, আমাদের নতুন করে শুরু করতে হবে।'

হেম বললেন, 'তুমি তো বলছ তোমার অভিযান শেষ। আর তোমার সেজদা এখন বদ্ধ উন্মাদ। ভয়ে পাগল হয়ে গেছেন।'

উপেন, উল্লাস, দেবব্রত এইসময় হেম এবং বারীনের কাছে এলেন।

উপেন বললেন, 'হেম তুমি সংযত আচরণ করো। অরবিন্দবাবুই বিপ্লবের হোমাগ্নি জ্বালিয়েছিলেন।'

হেম কাতরস্বরে বললেন, 'সেটাই তো আমার দুঃখ, তিনি এখন পালাতে চাইছেন কেন?'

দেবব্রত বললেন, 'তিনি অন্য স্তরে রয়েছেন। এক নতুন অধ্যায় তাঁর জীবনে শুরু হয়েছে।'

হেম বললেন, 'তিনি আমাদের নেতা ছিলেন— মৃত্যুদণ্ড বরণ করে তিনি আমাদের পথ দেখান।'

বারীন বললেন, 'সেজদা মুক্তি পাবেন।'

(চলবে)

রবিবারের বৈঠক
যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ৬ মে ২০১৮

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

আজও তাই করজোড়ে বলি, ‘ক্ষমা করো, ওই অপরাধ আমার ইচ্ছাকৃত নয়। দৈবকৃত। আমি তখন নিতান্তই বালক।’ যাইহোক, সেই অন্ধকারে গাইড তো চিৎকার করে উঠল। বাবা মা-ও ভয় পেয়ে গেলেন। একে বিদেশ-বিভুঁই, তায় সরকারি ব্যাপার। না জানি কী অশান্তি হয় আমাদের।

এদিকে গাইডের চিৎকার ও চেঁচামেচি শুনে অন্যান্য কর্মচারীরাও ছুটে এল। তারপর অন্য লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখিয়ে ওপরে নিয়ে এল আমাদের। রক্তচক্ষু গাইডকে বাবা চার আনা পয়সা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তবে ভাগ্য ভালো আমাদের কেউ কিছু বলল না। সবাই দোষারোপ করতে লাগল সেই গাইডকেই। সবাই তাকে ধমকাল আমার মতো একটা বাচ্চা ছেলের হাতে হ্যারিকেন দেওয়ার জন্য। ফলে আমাদের কোনও খেসারত দিতে হল না।

আগ্রা থেকে আমরা এলাম মথুরা। এখানে আমাদের দ্বারিকাধীমোর মন্দিরের কাছে মকদুম গলিতে এক পান্ডার বাড়িতে উঠেছিলাম। মথুরার পর বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উঠলাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘেই। মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করছিলাম। রোজ যেতাম চীরঘাটে যমুনায় স্নান করতে। বড় বড় কচ্ছপ তখন ডাঙায় উঠলে আমি ছুটে গিয়ে তাদের পিঠে উঠে পড়তাম। তারপর যমুনার অল্পজলে পুঁটিমাছের মতো তিড়িং বিড়িং করে লাফাতাম। নিজে নিজে স্নান করতাম।

মথুরা বৃন্দাবনের পর আমরা আবার গেলাম কাশীতে। হাতরানা জংশনে এসে তারপর ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ধরলাম। তখন ট্রেনের কামরায় জানালায় বড় রড থাকত না। অত্যধিক ভিড় হলে কুলির সাহায্যে জানালার ভেতর দিয়ে মাল গলিয়ে মারামারি করে ট্রেনে উঠতে হতো। আমরাও সেভাবেই উঠলাম। এই সময় প্রচণ্ড ভিড়ে কে যেন আমার পা মাড়িয়ে দিল। যে-পায়ে ঋষিকেশে হোঁচট খেয়েছিলাম সেই পায়ে। ফলে জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলাম। ট্রেনের মধ্যেই পায়ের কাটা জায়গাটায় পুঁজ জমে পেকে ফুলে উঠল। অনবরত কট কট করতে লাগল। কী কষ্ট। কাশীতে এসে ডাক্তার দেখিয়ে ভালো হলাম।

এই নিয়ে দুবার কাশীতে আসা হল। দিদিমা তখনও হরিদ্বারে। যাইহোক, আবার আমরা পাঁড় ঘাটে এসে রানি মাসিদের বাড়িতে উঠলাম। রানি মাসিমার দুই ছেলে শংকরদা ও কালুদা খুব ভালোবাসতেন আমাকে। আবার সেই দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে গান শোনা, গঙ্গায় স্নান, বিশ্বনাথের মন্দিরে খাওয়া, আরতি দেখা মনকে যেন নতুন করে ভরিয়ে দিল।

আমরা ফিরে এলে পাড়ার সবাই বাবার কাছে আবদার করল, ‘তীর্থদর্শন করে এলে ব্রাহ্মণভোজন করাতে হয়। অতএব সেই ব্যবস্থা হোক। সেই সঙ্গে অন্যদেরও হোক সাদর নিমন্ত্রণ।’ বাবা এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আবার ছাদে প্যান্ডেল বাঁধা হল। হালুইকর ব্রাহ্মণ এল। যজ্ঞিবাড়ি আয়োজন। ঠিক যেন বিয়েবাড়ি। এরপর থেকে বাবা তীর্থ করে এলেই এমন আয়োজন করতেন। তবে পরবর্তীকালে একবার দারুণভাবে মানসিক আঘাতপ্রাপ্তির পর বাবা এইভাবে লোকজন খাওয়ানো বন্ধ করেছিলেন।

আগেই বলেছি আমার বাবার চার বছর বয়সের সময় আমার ঠাকুরমা দেহরক্ষা করেন। বাবা তাঁর উদ্দেশ্যে এক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। যদিও ইতিমধ্যে গয়ায় পিণ্ডদান হয়ে গেছে, তবুও। সেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। লুচি, মিষ্টি, পোলাও, মাছ সব কিছুরই ঢালাও আয়োজন। তা বাবার ইচ্ছে হল ও সবই তিনি লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরি করে সবাইকে খাওয়াবেন। করলেনও তাই। কিন্তু নিমন্ত্রিত অতিথিরা যখন খেতে বসে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলতে লাগল, ‘লক্ষ্মী ঘি না আরও কিছু ডালডার সঙ্গে লক্ষ্মী পাইল করে নাম কিনছে।’ আমি তখন অতিথিদের মাটির ভাঁড়ে জল পরিবেশন করছিলাম। শুনে আমারই চোখে জল এসে গেল। সবাইকে বললাম, ‘না না। আমার বাবা বড় বড় টিন ভর্তি লক্ষ্মী ঘি আনিয়েছেন, আপনারা বিশ্বাস করুন।’ তবু তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। বললেন, ‘তুমি ছেলেমানুষ, এসব চালাকির তুমি কী বুঝবে? এই বাজারে লক্ষ্মী ঘি খাওয়ানো এত সস্তা নয়। লক্ষ্মী ঘিয়ের দাম জানো? এসবই ডালডার সঙ্গে পাইল।’ কথাটা বাবার কানেও উঠল। বাবা-মা এই সমস্ত আলোচনা শুনে এত দুঃখ পেলেন যে স্থির করলেন আর এইভাবে টাকা-পয়সা নষ্ট করে লোকজন খাওয়ানোর অনুষ্ঠান কখনও করবেন না।

ছোটবেলায় আমি প্রায়ই নানারকম ব্যাধিতে ভুগতাম। জ্বর জালা কোনও কিছু হলে বাবা আমাকে বুকে করে শিবপুরে বেণীবাবু অথবা মানিকবাবুর ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতেন। সেবার অ্যানিমিয়ায় ভুগে পড়াশোনা ঠিকমতো করতে না পারায় পঞ্চম শ্রেণিতে উঠতে পারলাম না। দুর্বলতার কারণে যেতে পারতাম না স্কুলেও। তখন ক্লাসে ওঠা-নামার সময়। বাবাও স্কুলে কিছু জানাননি। ফলে নাম কাটা গেল। পরে যখন সুস্থ হয়ে স্কুলে গেলাম তখনই জানতে পারলাম বিপর্যয়ের কথা। তখনকার যিনি হেডমাস্টারমশাই তিনি ছিলেন অত্যন্ত একরোখা প্রকৃতির। অন্য শিক্ষকরা যাঁরা আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন তাঁরা সবাই আমার পক্ষে সওয়াল করলেও, তিনি আমাকে স্কুলে রাখতে একদমই রাজি হলেন না। অগত্যা বাধ্য হয়েই তাঁর গোঁ-এর জন্য দু-ফোঁটা চোখের জলও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিদায় নিলাম শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় থেকে।

আমাদের বাড়ির কাছে ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণপুর হাইস্কুলে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন ভর্তির জন্য। এখানকার প্রধান শিক্ষক মহাশয় কালীচরণ আঢ্য আমার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে তাঁর স্কুলে বিনা পরীক্ষায় ভর্তি করে নিলেন আমাকে। আমি এই বিদ্যালয়ে নতুন সতীর্থদের পাওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়ের প্রভাব একসময় মুছেই ফেললাম মন থেকে। রামকৃষ্ণপুর হাইস্কুলই হল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কেন্দ্র এবং আদর্শ বিদ্যাপীঠ।

আবার বছর ঘুরে যায়। ফিরে আসে ১৮ ফাল্গুন। আবার তীর্থযাত্রা। বাবার বন্ধুরা হাওড়া স্টেশনে এসে চাপিয়ে দিলেন বি.এন.আর বোম্বে মেলে। সতর্কও করে দিলেন। অত্যন্ত দ্রুতগামী ট্রেন। অতএব সাবধান। তখন মেল বা এক্সপ্রেসের মানে বুঝতুম না। তাই মেলে চাপা দারুণ একটা আনন্দের ব্যাপার মনে হল। এবার যাত্রা দ্বারকায়। বোম্বে মেলের ভীরামগাম কোচে আমরা চেপে বসলাম। সেই ট্রেন পরদিন দুপুরে নাগপুরের ভয়াবহ অরণ্য পার হয়ে রাতে ভুসওয়ালা জংশনে আমাদের কোচটিকে কেটে রেখে ট্রেন বম্বের দিকে চলে গেল। এখান থেকে সৌরাষ্ট্র প্যাসেঞ্জার এসে আমাদের সেই কেটে রাখা বগিকে টেনে নিয়ে গেল সৌরাষ্ট্রে (বর্তমানে সুরাত)। সেখান থেকে ভীরামগাম মেল এসে বগিটিকে পৌঁছে দিল ভীরামগামে। এখান থেকে রাতের ওখা প্যাসেঞ্জারে দ্বারকা। দ্বারকায় আমরা মন্দিরের কাছে রামেরাম ধর্মশালায় তিনদিন ছিলাম। দ্বারকা থেকে সুদামা পুরী (পোরবন্দর) হয়ে প্রভাস। সেখানে সোমনাথ মন্দির ও ভালুকা তীর্থ দর্শন করে আজমেঢ়, সাবিত্রী পুষ্কর দর্শনের পর আবার কাশী। এসবের বিস্তারিত বিবরণ স্মৃতিকথায় লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তবে আমার লেখা ‘দ্বাদশ তীর্থ ভ্রমণ’ বইতে বিশদভাবে লেখা আছে সবকিছু।

দ্বারকা থেকে ঘুরে আসার পরই আমাদের গৃহদেবতা হিসাবে আমরা পেলাম এক দুর্লভ শালগ্রাম শিলা দামোদরকে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রও দামোদর শিলার সেবা করতেন। তবে কি না এই শিলাপ্রাপ্তি আমাদের খুব একটা সহজ উপায়ে হয়নি। নিমাই ঠাকুর শ্রীধর বিগ্রহ দেওয়ার পর থেকেই বাবা সমানে তাঁর কাছে আবদার করতেন দামোদর শিলাটিকে দেওয়ার জন্য। তিনি ‘দিচ্ছি দেবো’ করে করেও দিতেন না। অবশেষে একবার রাজি হলেন। তাই বিশেষ দিনে বিশাল আয়োজন হল। সাজ সাজ রব পড়ে গেল আমাদের বাড়িতে। কিন্তু না। নির্দিষ্ট দিনে বাবা শূন্য হাতেই ফিরে এলেন। দারুণ মনখারাপ হয়ে গেল আমাদের। বাবা তবুও হাল ছাড়েন না। নিমাই ঠাকুর বলেন, ‘এই বিগ্রহ কেন দিচ্ছি না জানো, বড় নিষ্ঠুর দেবতা। সকলের সহ্য হয় না। এর আগে এই বিগ্রহ আমি দু-একজনকে দিয়েওছিলাম। কিন্তু এমনই বিপর্যয় হয়েছে যে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে পথ পায়নি। অপঘাত মৃত্যুও হয়েছে কোনও কোনও বাড়িতে।’ বাবা তবুও নাছোড়বান্দা। বলেন, ‘আমার তো গরিবের সংসার। তিনটে মাত্র প্রাণী আমরা। ওই শালগ্রামের কৃপায় যদি মরেও মুক্তি পাই তো এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে?’ নিমাই ঠাকুর বললেন, ‘বেশ, সব জেনেও যদি একান্তই নিতে চাও তো সামনের অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে এসে বিগ্রহকে নিয়ে যাও। কেননা আমিও বেশ বুঝতে পারছি আমার দিন এবার আসন্ন। তবে এই বিগ্রহের সেবা করতে হবে নিষ্ঠার সঙ্গে। এর সেবা করলে নিত্য ভোগের ব্যবস্থা কিন্তু করতেই হবে। না হলেই বিপর্যয়।’ বাবা তাতেই রাজি। নিমাই ঠাকুর আর ফেরালেন না। অক্ষয় তৃতীয়ার শুভদিনে বাবাকে বহু প্রত্যাশিত দামোদর শিলা অর্পন করলেন এবং ওইদিনই মহা ধুমধামে আমাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হলেন শালগ্রাম দামোদর বিগ্রহ। *(চলবে)*

সাহিত্য সংবাদ

পাঁচ কবির কবিতাপাঠ ও আলোচনা

গত ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল একটি বিশেষ সাহিত্যানুষ্ঠান ‘কবিতায়-কথকতায়’। ‘আগামীর সংশপ্তক’ পত্রিকার পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় এই ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠানটি। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার বাণীপুর বেসিক সভাগৃহে সাহিত্যপ্রেমীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই অনুষ্ঠানে পাঁচজন কবির কবিতাপাঠ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আলোচনাধর্মী বক্তব্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে আগত কবি গিরীশ গৈরিককে এপার বাংলার পক্ষ থেকে বরণ করে নেন অগ্রজ

কবিরা। কবি গিরীশ গৈরিক ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন বর্তমান সময়ের এপার বাংলার কবি সঞ্জয় ঋষি, শুভঙ্কর গায়েন, বর্ষা কর্মকার ও প্রাণেশ ভট্টাচার্য। কবিতা বিষয়ক আলোচনায় ছিলেন কবি অমিতাভ দাস, কবি ও প্রাবন্ধিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক অসীম সরকার ও কবি সৈকত ঘোষ। কবিতা নির্জনতার সাধনা আর তার সঙ্গে মাটির টান আছে একথাই বারবার ঘুরে ফিরে উঠে এসেছে আলোচকদের কথায়।

রবিবারের চিঠি

যুগশঙ্খ SUPPLI
রবিবার, ৬ মে ২০১৮

গ্রন্থ সমালোচনা

ইতিহাসধর্মী হিটলারের জীবন

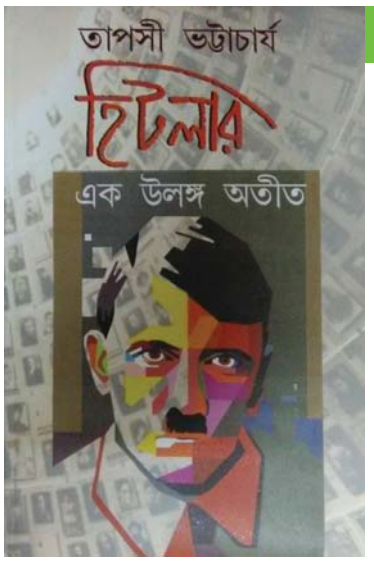

সোমনাথ আদক

চিরকালই ইতিহাসের কিছু চরিত্র নিয়ে মানুষের কৌতূহল অনেক। আর সেই চরিত্র যদি বিতর্কিত কোনও চরিত্র হয় তবে তো কোনও কথাই নেই। ইতিহাসের এমনই এক বিতর্কিত নায়ক হিটলারকে নিয়ে গোটা একটা বই পাঠকের কৌতূহলের বিষয় হবে বই কী।

'হিটলার এক উলঙ্গ অতীত' বইটি এমন একটি বই, যার নামেই পাঠক বইটি হাতে তুলে নিতে বাধ্য। বইটি মূলত ইতিহাসধর্মী হিটলারের জীবন। তাঁর উত্থান, নাৎসিবাদ, নাৎসি দলের উত্থান— এসবের ওপর ভিত্তি করেই বইটির পটভূমি রচিত হয়েছে। বইটির প্রাক্‌কথনও লেখিকা খুব সুন্দরভাবেই লিখেছেন। এতেই খানিকটা স্পষ্ট বইটি কোন অভিধায় রচিত হয়েছে।

বইটির শুরুতে হিটলারের জীবন সম্পর্কে দু-চার কথা বলা হলেও হিটলারের রাজনীতি প্রবেশের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কীভাবে হিটলার জার্মান প্রেসিডেন্টকে দিয়ে 'রাইখস্ট্যাগ ফায়ার ডিক্রি' পাশ করান এবং নাৎসি দলের হাতে একক ক্ষমতা আনেন তা এই বইটিতে উল্লিখিত হয়েছে। কোনওদিনই ক্যাথলিক চার্চ ও স্কুলগুলি হিটলারের আক্রোশের শিকার ছিল না। তাহলে পরবর্তীতে কী এমন ঘটেছিল যার জন্য হিটলার ওই চার্চ ও স্কুলগুলির বিরুদ্ধে গেলেন এবং 'ন্যাশনাল রাইখ চার্চ' প্রতিষ্ঠা করলেন?

হিটলারের কুটনৈতিক নীতির অন্যতম হল, 'পলিসি অব লেবেন স্রাউম'— অর্থাৎ বাঁচার জন্য জায়গা চাই। এই নীতির উপর ভিত্তি করেই হিটলার প্রতিবেশী দেশ আগ্রাসনের দিকে নজর দেন। কীভাবে চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ডের মতো একের পর এক দেশ হিটলারের আক্রমণের শিকার হয়, তা উঠে এসেছে লেখিকার কলমে। এ কথা হলফ করে বলা যায় এই বইটি আর পাঁচটা বইয়ের থেকে ভিন্ন স্বাদের সন্ধান দেয়।

হিটলার ও তাঁর দলের নাৎসি বিদ্বেষ এমন এক জায়গায় পৌঁছয় যেখানে মগজ ধোলাই, বন্ধ্যাত্বকরণ, যন্ত্রণাহীন মৃত্যু, সরকারি গণহত্যা, গ্যাস চেম্বারে হত্যা ইত্যাদির মতো হৃদয়বিদারক ঘটনাগুলি খুব সহজেই ঘটানো হতো। এই ঘটনা সমূহের নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে মোড়া ওই বইয়ের প্রতিটা পাতা। শুধু হত্যাই নয়, এই বইয়ে উঠে এসেছে কীভাবে সামান্য খাবারের জন্য অথবা বিনা কারণেই নাৎসি সৈন্যদের লালসার শিকার হতে হয়েছে প্রচুর ইহুদি নারীকে। তৎকালীন হিটলার ও সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক স্থান পেয়েছে এই বইতে। যা অন্য মাত্রা যোগ করেছে বইটির বিষয়বস্তুতে।

বইটি পড়তে পড়তে বোঝা যায় লেখিকা তাপসী ভট্টাচার্যের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল তাঁর এই বই। বইটির বাইন্ডিং ও প্রচ্ছদ খুব সুন্দর, তবে কয়েকটি জায়গায় ছাপার কিছু ভুল চোখে পড়ল। এত ভালো গবেষণাধর্মী বইতে ছাপার এই ভুল একদমই শোভনীয় নয়।

● এক উলঙ্গ অতীত | তাপসী ভট্টাচার্য | দে পাবলিকেশনস | দাম: ২৫০ টাকা

গ্রন্থ সমালোচনার জন্য আপনার প্রকাশিত ২ কপি বই পাঠান এই ঠিকানায়:
যুগশঙ্খ সাপ্লি, ৭ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯
ই-মেল:
jugasankha.suppli@gmail.com

সাপ্তাহিক রাশিফল

এই সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

৬-১২ মে, ২০১৮

মেষ: মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের ৬-৭ তারিখের মধ্যে সমাজে বৃদ্ধি পাবে যাবতীয় মান-সম্মান। মনের মধ্যে এযাবৎকাল চলে আসা অস্থিরতা ও অশান্তির ভাব অনেকটাই কেটে যাবে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবনটা শুরু করতে পারবেন। ৮ তারিখ দিনটি সবদিক থেকেই অনুকূল। অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে। সপ্তাহের মধ্যভাগে মানে ৯-১০ তারিখের মধ্যে আপনার আর্থিক অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হবে। দম্পতিদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি লক্ষণীয়। অন্তভাগে কোনও ইন্টারভিউ দিলে তাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ১১-১২ মে তারিখের সময়টা সমস্যার মধ্যে দিয়ে কাটবে।

বৃষ: ৬ ও ৭ মে দিনদুটি রাজনীতিবিদদের জন্য শুভ। বাড়িতে কোনও নতুন জিনিস ক্রয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়। এসময়ে বিরোধীরা সক্রিয় হয়ে উঠলেও আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। ধৈর্য ও শান্তির সঙ্গে কাজ করলে ৮ তারিখ দিনটিতে যাবতীয় সরকারি কাজে আসবে কাঙ্ক্ষিত সফলতা। ৯-১০ তারিখে আধ্যাত্মিক ভাবনা-চিন্তায় অনেকটা সময় ব্যয়িত হবে। নতুন লোকেদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আপনার ভাবনা-চিন্তার গণ্ডিটাকে প্রসারিত করবে। অন্তভাগের সময়টা ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ। অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে।

মিথুন: এই রাশির জাতক-জাতিকাদের প্রথমেই বলব, সপ্তাহের শুরুতেই মানসিক শান্তি পাবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের পরিশ্রমে এগিয়ে যাবে অনেকটাই। আচমকা ধনপ্রাপ্তির সুযোগ পরিলক্ষিত হয়। ৭ তারিখে ব্যবসার অবস্থা আগের থেকে অনেকটা উন্নত হবে। পরিকল্পনামাফিক সমস্ত কাজ হওয়ার দরুন আসবে মানসিক প্রফুল্লতা। ৮-১০ তারিখের মধ্যে আপনার বেশিরভাগ সময় আমোদ-প্রমোদেই কাটবে। অন্তভাগে নিজের লক্ষ্যের দিকে আপনি কঠোর মনোযোগ দেবেন এবং লক্ষ্য পূরণে কোনওরকম চেষ্টার খামতি হবে না।

কর্কট: গোড়াতেই বলব গুপ্ত শত্রুর থেকে সাবধানে থাকুন, না হলে বিপদ বাড়তে পারে। ৮-১০ তারিখের মধ্যে লাভদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এসময়ে একাধিক উৎস থেকে ধনলাভের স্পষ্ট সুযোগ। ব্যবসায় উন্নতি লক্ষণীয়। ১০ তারিখ দিনটি অবশ্য মিশ্র ফলদায়ক। ১১-১২ তারিখের মধ্যে আপনার সামাজিক মর্যাদা অনেকাংশে বাড়বে। সমাজে, জাতিতে, রাজনীতিতে আপনার প্রভাব বাড়বে।

সিংহ: সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের সপ্তাহের আদ্যভাগে এতদিনকার চলে আসা যাবতীয় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। ধনপ্রাপ্তির জন্য আপনার যাবতীয় পরিকল্পনা সঠিক পথেই এগোবে। সপ্তাহের মধ্যভাগে সরকারি তরফে সম্মানপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। শত্রুপক্ষ আপনাকে নানাভাবে বিব্রত করার চেষ্টা করলেও কোনওভাবেই তারা সফল হবে না। অন্তভাগেও সামাজিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাবে আপনার মান-সম্মান। রাজনীতিবিদদের জন্য সপ্তাহের অন্তভাগের সময়টা শুভ।

কন্যা: সপ্তাহটির সূচনাতেই বাড়িতে অতিথি সমাগমে আপনি অনেকটাই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা এই সময়টা মন দিয়ে পড়লে পরে তার ফল মিলবে। এইসময়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশে আপনি অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে পারেন। মধ্যভাগে মানে ৮-৯ মে-র মধ্যে ব্যবসার কাজে প্রবল চাপ পড়লেও আপনি দক্ষতার সঙ্গে তা সামলে নিতে পারবেন। পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে এতদিন ভাইবোনদের সঙ্গে চলে আসা ঝামেলার সমাধান হয়ে যাবে এই সপ্তাহেই এবং অবশ্যই পরিবারের কোনও বয়স্ক ব্যক্তির সহায়তায়। তবে নিজের রাগের উপর সংযম বজায় রাখুন। অন্তভাগে মূলত ১১ তারিখে অফিসে বস আপনার কাজে সন্তুষ্ট থাকবেন।

তুলা: ৬ ও ৭ তারিখ দিনদুটি আপনাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। এই সপ্তাহের আদ্যভাগে সফরে গেলে তা আপনার জন্য লাভজনক প্রমাণিত হবে। ৮ তারিখ দিনটি মিশ্রফলদায়ক। গোপন শত্রুরা প্রবল হয়ে উঠে আপনার ক্ষতি করার সম্ভাবনা করবে। ১১-১২ তারিখের মধ্যে সমস্ত সরকারি কাজে আসবে সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে আপনার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা আপনার কাজে প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

বৃশ্চিক: বৃশ্চিক জাতির জাতক-জাতিকারা সপ্তাহের প্রথমভাগ থেকেই পাবেন যাবতীয় মানসিক শান্তি। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই সপ্তাহটি শুভ। নিজের প্রতিভা প্রদর্শনের পরিপূর্ণ সুযোগ আপনারা এই সপ্তাহে পাবেন। তবে সপ্তাহের মধ্যভাগে বিশেষত ৮-১০ তারিখের মধ্যে নানান কাজে আপনি ব্যর্থ হবেন। জীবনের এমন একটি পর্যায়ে এসে আপনি দাঁড়াবেন, যেখান থেকে যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও বাধা আসবে। ১১-১২ তারিখের মধ্যে আপনার রাশির পঞ্চম স্থানে চন্দ্রর পরিভ্রমণ শুভ প্রমাণিত হবে।

ধনু: এই রাশির জাতক-জাতিকাদের শুরুতেই বলব, সব কাজ আপনার পরিকল্পনামাফিক হবে, সেজন্য বজায় থাকবে আপনার যাবতীয় মানসিক সন্তুষ্টি। নতুন কিছু প্রাপ্তিতে আপনার জীবনের সবদিকেই উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। ৮ তারিখ দিনটিতে বাড়িতে আত্মীয়-পরিজনের সমাবেশের যোগ দেখা যায়। ৯-১০ তারিখের মধ্যে একাধিক উপায়ে আয়ের যোগ দেখা যায়। এসময়ে বৃদ্ধি পাবে আপনার সামজিক মান-সম্মান। তবে অন্তভাগে বিশেষত ১১ তারিখ দুপুরের পর থেকে কলহে জড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা যায়।

মকর: সপ্তাহের আদ্যভাগের সময়টা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে শুভ। যাবতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এসময়ে মনে স্থান দিলে তাকে রূপায়িত করার প্রচেষ্টাও আপনি করবেন। মানসিকভাবে এই সময়টা আপনি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। ৮-১০ তারিখের সময়টা আপনাদের জন্য শুভ। সকল মানসিক চাপ, মানসিক চিন্তা এসময়ে শেষ হয়ে নতুন যাত্রাপথের সূচনা হবে। ১১ তারিখে চাকরি, ইন্টারভিউ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সফলতার যোগ প্রতীয়মান হয়।

কুম্ভ: ৬ ও ৭ তারিখের মধ্যে শত্রু আর বিরোধীরা আপনার উপর সক্রিয় হয়ে উঠবে। তাদের প্রতিটি গতিবিধি ও কার্যকলাপ ঠিকমতো নিরীক্ষণ করুন। না হলে অর্থনাশের প্রবল আশংকা রয়েছে। তবে ৮ তারিখ দিনটি আপনার জন্য ভালো নয়। একটু সমঝে চলুন। চাকরিতে বস আপনার কাজে সন্তুষ্ট হবে না। তবে ৯-১০ তারিখের মধ্যে আপনার যোগ্যতা সকলের সামনে খোলাখুলি প্রমাণ হবে। নিজের পেশা বা ব্যবসাতে নতুন কোনও কর্মপরিকল্পনা আনলে তা বাস্তবায়িত হবেই।

মীন: ৬ ও ৭ তারিখের মধ্যে আপনার যাবতীয় মানসিক চাপ খুবই বেড়ে যাবে। লেনদেন-সংক্রান্ত ব্যাপারে অবলম্বন করুন যাবতীয় সাবধানতা। এসময়ে আচমকা আপনার খরচও বেড়ে যাবে। ৮-৯ তারিখের মধ্যে কোনও বিবাদে জড়িয়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা যায়। পারিবারিক বাতাবরণ খুব একটা শান্তিপূর্ণ থাকবে না। ১০-১২ তারিখের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে আপনার গুরুত্ব বাড়বে।

দ্রোণাচার্য

খুব শীঘ্রই আবার শুরু হবে ছোটদের বৈঠক। ছোটরা নজর রেখো কিন্তু...

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: **বিপ্লব রায়** | সাপ্লি টিম: তন্ময় মণ্ডল, শর্মিলা চন্দ্র, বিপাশা চক্রবর্তী, দোয়েল দত্ত
চিঠি পাঠানোর ঠিকানা: ৭ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯ • ই-মেল: jugasankha.suppli@gmail.com • সাপ্লি সংক্রান্ত যোগাযোগ: ০৩৩ ৪০৬০৫৮৩৭